বসন্ত ও ঝরাপাতা

শক্তিপদ রাজগুরু

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রিয়জনের তরে

হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর মেজাজটা আজ ভালো নেই। সব কেমন বিশ্রী, বিরক্তিকর বোধ হয়। মেজাজটা অনেকখানি আকাশের মত। আকাশ যেমন কখনও থাকে ঝকঝকে আলোয় ভরা, আবার কখনও মেঘে মেঘে ঢেকে যায়, মেজাজটাও তেমনি।

তাছাড়া হরিনারায়ণবাবুর মত লোকের মেজাজ খারাপ হবার মত তেমন কিছুই ঘটেনি।

বাড়িতে মানুষ বলতে দুজন, কর্তা আর গিন্নী মনোরমা।

হরিনারায়ণবাবুর স্ত্রী মনোরমা এমনিতে খুবই সাদাসিদে ঘরোয়া ধরনের মহিলা। এতবড় ব্যবসাদার, কারখানার মালিক, ধনী লোক তার স্বামী। বিরাট অফিস। আরও নানা কিছু ব্যবসা হরিনারায়ণবাবুর। দিল্লীতেও অফিস আছে। বোম্বাই-এর মত কর্মব্যস্ত জায়গায় নিজের বিরাট কারখানা, ফোর্ট এরিয়ায় নিজস্ব অফিস। বহু কর্মচারী। জুহুর ওদিকে সমুদ্রতীরে সুন্দর বাংলো।

বিলাস ব্যসন প্রাচুর্যের অভাব নেই মনোরমার।

কিন্তু তার যেন ওসবের প্রয়োজন নেই।

ওই বিরাট প্রাসাদে বেশ কিছু আশ্রিত-অসহায় দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর পুজা অর্চনাও করে প্রতিদিন ঘণ্টা-কয়েক ধরে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, মিঃ হরিসিং-এর ছেলের বিয়ের রিসেপসন, গ্রাণ্ড-এ পার্টি—সবাই সস্ত্রীক যাবে। হরিসিং বার বার করে যেতে বলেছেন—আজ যাবে তুমি।

মনোরমা চাইল স্বামীর দিকে। যেন ওই কথাটার গুরুত্বই দেয় না সে। আপন মনে উলের সোয়েটারে ঘর তুলে চলেছে। তার একমাত্র ছেলে চঞ্চল থাকে লণ্ডনে। সেখানের কোন ইনজিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে।

মনোরমা তার একমাত্র ছেলেকে লণ্ডনে পাঠাতে চায়নি। বলেছিল—ওকে ওই বিজাতের দেশে কেন পাঠাবে। এখানে যা পড়েছে তাতে তোমার ব্যবসাপত্র দেখতে পারবে। তুমিও তো এখানের বিদ্যে নিয়েই এতসব করেছো। তাহলে ওকে পাঠাচ্ছ কেন বাইরে।

হরিনারায়ণবাবুর ক্ষেত্রে কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়। হরিণারায়ণ-বাবুর বাবা সামান্য অবস্থাতে ছোট করে একটা ফেব্রিকেশনের কারখানা চালু করেন। নিজের পরিশ্রমে ক্রমশ বাড়ান সেই কারখানা। আর একটা শেড তৈরী করে লেদ-গ্রাইণ্ডিং মেসিন—আরও কিছু যন্ত্রপাতি বসান।

হরিনারায়ণ তখন কলেজে পড়ছে। এমনিতে মেধাবী ছাত্র। ভেবেছিলেন তরুণ হরিনারাযণ এম. এ. পাস করে কোন কলেজে প্রফেশারী করবেন।

আর শিক্ষাদানই সবচেয়ে সম্মানিত বৃত্তি এই কথাটা তার মাথাতে ঢুকিয়েছিল হরিনারায়ণের বাল্যবন্ধু শেখর। শেখর সেন তখন স্বদেশীর দলে মিশেছে। বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ। মানুষের সেবা করার ব্রতও তার মনে। হরিনারায়ণ অতটা না পারলেও বন্ধুকে ভালোবাসে, তার মতের দামও দেয়।

শেখর বলে, একটা কিছু ভালো কাজ করা দরকার। মানুষের সেবা—শিক্ষাদান এমনি কাজেরই আজ বেশী দরকার রে। অর্থ নয় পরমার্থই বড়।

হরিনারায়ণও ভাবছে কথাটা।

কিন্তু তস্য পিতৃদেব তখন জীবনে পরমার্থের সন্ধান পেয়ে গেছেন। বিরাট টাকার সরকারী কাজ হাতে পেয়েছেন বহু মেহনত করে। কাঠখড় পুড়িয়ে। কারখানা একটা থেকে দুটো হয়েছে। বাইরের মালও কিনতে হচ্ছে।

তিনিই হরিনারায়ণকে বলেন, বি. এ. পাস করেছো—যথেষ্ট হয়েছে। এবার ব্যবসা দেখভাল শুরু করো।

হরিনারায়ণের চোখে তখন অনেক স্বপ্ন। সমাজসেবা—দেশোদ্ধার। নিপীড়িত মানুষের জন্য কিছু করার নেশা তার মনে। শেখর তখন এম. এ.-র সঙ্গে আইনও পড়ছে। বন্ধুরা সব এগিয়ে যাবে নতুন জগতে আর থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে হরিনারায়ণ।

তাই বাবার কথায় বলে সে, এম. এ.টা পাস করি বাবা!

পিতৃদেব বলেন—কি হবে ওতে। ল্যাজ গজাবে? অবশ্য কেরানী-গিরি করার সুবিধা হবে হয়তো। কিন্তু কত টাকা মাইনে পাবে? পাঁচশো—সাতশো—হাজার—দু হাজার।

অংকটা তখনকার দিনে লোভনীয়ই। তবু হরিনারায়ণ বলে, অধ্যাপনা করতে চাই! কোন কলেজের প্রফেসর—গবেষক।

বাবা হিসাব বোঝেন। তিনি বলেন, তার চেয়ে কিছু গবেষক—শিক্ষিত ছেলেদের চাকরীর ব্যবস্থা যদি করতে পারো, অন্নসংস্থান যদি করতে পারো তাদের সেইটাই প্রকৃত সমাজসেবা হবে। ব্যবসা বাড়ছে—একে বাড়িয়ে নিতে পারলে বিশাল কিছু করতে পারবে। স্থায়ী কিছু। তাই বলছি ওসব সৌখীন আদর্শ ভাবনা ছেড়ে কাজে নেমে পড়ো। কাজের কাজ কিছু করার চেষ্টা করো। এই তার সময়, সুযোগ। সুযোগ একবারই আসে। তাকে হাতছাড়া করতে নেই।

হরিনারায়ণের কথাটা মনে ধরেছিল। সে বিরাট কিছু গড়তে চায়। সেই স্বপ্ন, শপথ নিয়েই সেদিন ইউনিভার্সিটি ছেড়ে বাবার কারখানাতে যোগ দিয়েছিল। ডুবে গিয়েছিল তারপর নতুন এক জগতের উন্মাদনায়।

বাবাও তাকে মিথ্যা স্তোক দেননি। আর হরিনারায়ণবাবুও জীবনে কাজে ফাঁকি দেননি। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন।

সেই কাজের ভিড়ে পুরনো দিনের বন্ধুরা সব কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। দূরদূরান্তরে হারিয়ে গেছে। টিকে আছে শুধুমাত্র একজন। সে শেখর সেন।

শেখর অবশ্য সেদিন সব শুনে বলেছিল, তোর বাবা মন্দ বলেননি হরিনারায়ণ। যদি সত্যিকার তেমন কিছু গড়তে পারিস সেখানে বেশকিছু ছেলের অন্ন জুটবে। কিছু শিক্ষিত গবেষক, ইনজিনিয়ার কাজ পাবে। তবে বড় হলে যেন এই কথাটা ভুলে যাস নে।

এখন হরিনারায়ণ কাজে ব্যস্ত।

সরকারী অফিস—দুর্গাপুর রাউরকেল্লা বোকারো নানা ফার্মের বিভিন্ন কাজ করে তারা। কোল ইন্ডিয়ার নানা যন্ত্রপাতি তৈরী করে। ফলে ছুটোছুটি করতে হয় বাইরে ওইসব জায়গাতে। দিল্লী-বোম্বাইও যাতায়াত করছে কাজ নিয়ে।

তবু সময় পেলে হরিনারায়ণ শেখরের বাড়িতে আসে। শেখর সেন এখনও সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এবার ল ফাইন্যাল দেবে।

শেখরের কথায় হরিনারায়ণ বলে, না রে। দেখবি আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিছু আদর্শ থাকবেই।

শেখর বলে, আদর্শটাই জীবনে সব থেকে বড় রে! অন্ধকার রাতে ধ্রুবতারার আলো যেমন নাবিকদের পথ দেখায়। আদর্শও তাই। দেখবি আইন পাস করে ওকালতি শুরু করে আমি অন্তত একটা কাজ করবো এ দেশে ন্যায়বিচার, আইনের আশ্রয় গরীব মানুষরা পায় না, সে সাধ্য তাদের নেই, আমি আর কিছু করতে না পারি অন্তত তাদের জন্য আইনের আশ্রয় দেব। তারা যাতে ন্যায়বিচার পায়—তাই-ই করবো। এই হবে আমার আদর্শ।

হরিনারায়ণ এর মধ্যে ব্যবসার ধাত বুঝেছে। সে জেনেছে অর্থের প্রয়োজনটা বড় বেশী। বাঁচতে গেলে আদর্শকে বাঁচাতে গেলে ওটার দরকার।

তাই বলে, কিন্তু তাতে তো পশার জমবে না। টাকা তো চাই। বিপাশা কি বলে—

ইদানীং শেখর সেন কলেজের সহপাঠিনী বিপাশার সঙ্গেও মিশছে। বোধ হয় বিয়েথাও করবে তারা।

বিপাশার কথা উঠতে শেখর বলে, বিপাশাকে তো চিনিস তুই। তার দিক থেকেও কোন অমত নেই রে। সে তাই জেনেশুনে একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছে। নিজেরটা নিজে চালিয়ে নেবে—আমার ওপর নির্ভরশীল হবে না সে।

হরিনারায়ণ হাসে—প্ল্যান প্রোগ্রাম তাহলে সব ঠিক করে ফেলেছিস। নেমে যা আদর্শের লড়াইয়ে!

শেখর বলে, পাশে থাকবি তো! সবাই তো কাটলো প্রায়। নীলু, বিকাশ যোগেন। আছিস মাত্র তুই!

হরিনারায়ণ বলে, তোকে ছেড়ে যাবো না। অবশ্য তুই যদি তোর আদর্শের গুঁতোয় আমাকে তফাতে সরিয়ে না দিস।

তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। হরিনারায়ণবাবু এখন সংসারী। আর মাঝারি ধরনের শিল্পপতি। কলকাতা শহরে একডাকে তাঁকে চেনে সবাই। মনোরমা এই সংসারের হাল ধরেছে।

হরিনারায়ণবাবু কড়া হাতে ধরেছেন ব্যবসার হাল—আজ বাবা নেই।

কিন্তু হরিণারায়ন বাবার সেই ছোট কারখানাকে আজ বিরাট

কারখানায় পরিণত করেছেন। বোম্বাই-এর নতুন গড়ে ওঠা ডোম্বিভ্যালি অঞ্চলেও কারখানা গড়েছেন। শাখাপ্রশাখা মেলে এখন বনস্পতির মত কায়েম হয়ে জুড়ে বসেছে চৌধুরী এনটারপ্রাইজ লিঃ.

আজ তাঁর ছেলে চঞ্চলকে বিলেত পাঠাতে চলেছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। স্ত্রীর কথায় হরিণারায়ণের অতীতের দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে।

তিনি সেই অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট হয়েই রয়েছেন। যদিও অর্থ প্রতিষ্ঠার চাপে সেই কথাটা চাপা পড়ে গেছে,তবু নিজে তা জানেন। তাই ছেলেকে বিদেশের ডিগ্রী ছাপ মারতে চান। স্ত্রীর কথায় বলেন হরিনারায়ণ, এখন শিক্ষার যুগ। বড় হতে গেলে তার দরকার আছে। তাই চঞ্চলকে বিলেতে পাঠাতে চাই। ও যাবে।

চঞ্চলও তাই চায়।

মায়ের অমতে তাই সে বলে, মিথ্যে ভাবছো মা—বিলেতে কত বাঙালী, কলকাতার ছেলে আছে জানো? সেখানেও ঘটা করে দুর্গা-পুজো কালীপুজো স্বরস্বতীপুজো হয় জানো!

পুজোর নামে মনোরমা কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

চঞ্চলের অবশ্য কলকাতায় এখন বন্ধুর অভাব নেই। নরেন বসন্ত প্রমোদরা তো ছেলেবেলার বন্ধু। তাদেব অধিকাংশই সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। চঞ্চলের গাড়ি টাকা সব আছে, তাই ওরা চঞ্চলের সঙ্গে বেশী মেশে। এদের সামর্থ্যও সীমিত।

সুতরাং তারা বলে সেদিন কোন রেস্তারাঁয় বসে, আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছিস চঞ্চল!

নরেন একটু কবিত্ব করে। সে বলে, অনাথ করে চলে যাবি চঞ্চল? বিলেতে দেদার সস্তা মাল আর মেয়েছেলেও অঢেল। ফিরবি তো রে!

চঞ্চল হাসে।

প্রকাশ বলে, রাজপুত্র ঘরে ঠিকই ফিরবে।

তাই ফিরে আয় তাড়াতাড়ি! তোর পথ চেয়েই থাকবো!

বন্ধুরাও চোখের জলে বিদায় দেয় চঞ্চলকে।

…ক'টা বছর পার হয়ে গেছে।

মনোরমা ছেলেকে ফোন করে। খবরাখবর নেয়।

এ দেশ থেকে মাঝে মাঝে জিনিসপত্রও পাঠায়। ছেলের জন্য সোয়েটার বুনছে এখন।

হরিনারায়ণবাবুকে ব্যবসার খাতিরে পার্টি, রিসেপসন এসব অনুষ্ঠানে যেতে হয়। হরিসিং তার বড় পার্টি। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার কাজ দেয় সে। তার ছেলের বিয়েতে সস্ত্রীকই যেতে হবে।

আর ওই সব পার্টিতে ব্যবসার জগতে অনেক তাবড় ব্যক্তিত্বই আসে। অনেক সরকারী বড় আমলা মন্ত্রীদেরও শুভাগমন ঘটে। ফলে জানাশোনা ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। 'রিলেশন' অর্থাৎ যোগাযোগও গড়ে ওঠে। ওরা নিমন্ত্রণে যায় না—ব্যবসার জাল ফেলতে যায়। ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তার থেকেও ব্যবসার স্বার্থপরতার রূপটাই ফুটে ওঠে। তারপর শুরু হয় পানভোজন।

ওই ভদ্রস্থ কেতাদুরস্ত শান পালিশ করা সমাজের নারীপুরুষদের ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ে এক একটা আদিম স্বার্থপর সত্তা জেগে ওঠে।

মনোরমার মত ঘরোয়া মেয়েদের সমাজের সেই উদগ্র রূপটা বিশ্রী, অসহ্য বোধ হয়।

তাই এড়িয়ে যেতে চায় মনোরমা। সে বলে, যেতে হয় তুমিই যাও। আমার আজ জয় মঙ্গলবারের ব্রত আছে।

হরিনারায়ণবাবুর মেজাজটা বিগড়ে ওঠে, রাখো তো তোমার ব্রত। চলো।

মনোরমা এমনিতে শান্ত। স্বামীর কোন কাজে সে বাধা দেয় না। কিন্তু সে তার নিজের মতামত, রুচি সম্পর্কে একজায়গায় কঠিন, গোঁড়া, সেকেলে। আর সেটাকে সে মেনে চলে।

স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে সোয়েটারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মন্তব্য করে, চঞ্চলকে সুন্দর মানাবে, না?

হরিনারায়ণবাবুকে সমাজে দু'একটা কথাও শুনতে হয়। তাঁর স্ত্রী যে পার্টিতে যায় না এনিয়ে দু'একজন মন্তব্যও করে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, আমার কথার জবাব দিলে না?

মনোরমা বলে, বললাম তো। ওসব আমার ভালো লাগে না।

হ্যাঁ—চণ্ডলের ফাইন্যাল পরীক্ষা তো সামনের নভেম্বরে। পরীক্ষা হলেই দেশে ফিরতে বলো বাপু। ক'বছর হয়ে গেল।

মনোরমা উঠে চলে যায় ভিতরে। হরিনারায়ণবাবুর ওই পার্টি'তে যাবার কথাটার কোন গুরুত্বই দিল না সে।

হরিনারায়ণবাবুর মেজাজটা বিগড়ে যায়। মনোরমা যেন ইচ্ছে করেই তাঁকে অবহেলা করে গেল নিদারুণ ভাবে। আর অফিস-কারখানায় কোন কর্মী তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করার কথা ভাবতেই পারে না। এর সিকি ভাগ করলে তাকে শাস্তি দিতেন হরিনারায়ণ বাবু। কিন্তু তাঁর বাড়িতে ওই মনোরমা কোন কড়া কথা বলে না। সহজ সুন্দর ব্যবহার। তবু কোথায় যেন কঠিনই। সেই কাঠিন্যের দেওয়ালে মাথা ঠুকে হতাশ হন পরাক্রান্ত শিল্পপতি হরিনারায়ণ চৌধুরী।

হাসে শেখর সেন।

বল কি হে হরি, বৌঠান একেবারে জিরো করে দিলেন তোমার মত হিরোকে। নাঃ বৌঠানের গার্টস্ আছে বলতে হবে।

হরিনারায়ণ এখনও শেখর সেনের এখানে আসেন সময় পেলেই। শেখর সেনের এখন প্র্যাকটিস বেড়েছে। তার নাম পরিচিতিও হয়েছে উকিল হিসাবে।

এখন কলকাতার বারের সে একজন জনপ্রিয় উকিল। তার সওয়াল জবাবও বেশ ধারালো, ঝাঁঝালো। কিন্তু তার চেম্বার বা হালচালের কোন উন্নতিই দেখা যায় না। সংসারের জটিলতা সমস্যাও কিছু বেড়েছে।

হরিনারায়ণ জানেন সবই। শেখর কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন এ নিয়ে কোন অনুযোগ, দুঃখও প্রকাশ করেনি।

তার স্ত্রী বিপাশাও ছিল স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। শেখর সেন উকিল হয়ে তার জীবনের সেই আদর্শের কথাটা ভোলেনি।

তার মক্কেলদের অধিকাংশই গরীব। কোন কারখানার মজুর। না হয় গরীব ভাড়াটে ; বাড়িওলার অত্যাচারে অতিষ্ঠ কোন গরীব গৃহবধূ—স্বামী তাকে অস্বীকার করেছে, না হয় কোন গরীব কেরানী, মালিক তাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছে।

তারা বলে, টাকাকড়ি বেশী তো নেই উকিলবাবু। যদি চাকরি পাই ফিস্ দিয়ে দেব।

কোন অসহায় মহিলা বুভুক্ষ সন্তানদের নিয়ে এসে কেঁদে পড়ে—বাবা বাঁচান। স্বামী আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। দুধের বাচ্চাদের নিয়ে পথে পথে ঘুরছি। খোরপোষও কি পাবে না এরা! এদের কি দোষ!

শেখরবাবু বলেন, বসো মা। তোমার কথা সব শুনবো।

অন্য একজন মক্কেলকে বলে, শিশির তোমার কেস অনেক স্ট্রং। আমরা জিতবোই। তুমি চাকরি ফিরে পাবে উইথ ফুল পে।

শিশির প্রণাম করে শেখরবাবুকে—সবই আপনার দয়া!

না—না! শেখর সেন ওসব মানতে চায় না।

ওদিকে শেখর সেনের মুহুরী ভজহরি করাতি ওৎ পেতে ছিল। এক একজন মক্কেল ধরছে আড়ালে।

কই হে। উকিলবাবু দানছত্র করছেন করুন। আমি তো দানছত্র খুলিনি। আমার ফি, কোর্টের দাখিলা, পেশকারের নজরানা, বেলিফের খরচ—কুল্যে পঁয়ত্রিশ টাকা দাও তো। ওহে শিশিরবাবু, তোমার চল্লিশ টাকা নাহলে কেস উঠবে না, তলিয়ে যাবে!

ভজহরি করাতি অন্তরালে করাত চালাতে থাকে!

—ভজহরি কাকা!

চমকে ওঠে ভজহরি। উকিলবাবুর মেয়ে মহাশ্বেতার ডাক শুনে। কলেজে পড়ছে। এর মধ্যে মহাশ্বেতাও বাবার অনেক কেসের ডিকটে-শন নেয়। আইনের বইপত্র ঘেঁটে রেফারেন্স বের করে দেয়। এর মধ্যে স্টেনো টাইপও শিখে গেছে।

ভজহরি এর মধ্যে ওইভাবে সংগৃহীত টাকাটা কোঁচড়ে গুঁজে নিপাট ভালোমানুষের মত এগিয়ে যায়।

—মা!

মহাশ্বেতাকেই এখন সংসার দেখতে হয়। মা মারা যাবার পর দেখেছে বাবা কেমন ভেঙে পড়েছেন, ওই কর্মব্যস্ত মানুষটির সব কাজ যেন থেমে গেছে।

মক্কেলরা আসে, সামান্য সামর্থ তাদের।

সেদিন কোন কোম্পানীর পাবলিক রিলেশন অফিসার এসেছেন।

শিশির একা নয়—আর দশজন কর্মীকে তারা বেআইনীভাবে তাড়িয়েছে, আর তাদের হয়ে মামলা লড়ে আজ জিততে চলেছে শেখরবাবু। তাই কোম্পানী এসেছে মোটা টাকার অফার নিয়ে, তাদের কেস-এর ব্রিফ নিতে হবে।

টেবিলে দশ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে বলেন ভদ্রলোক, আমাদের ব্রিফটা নিন শেখরবাবু! টাকা যা লাগে দেব। আর ভবিষ্যতে কোম্পানীর বাঁধা উকিলই হবেন। মাসে ধরুন হাজার তিন টাকা বাঁধা ফি!

হাসে শেখরবাবু, আপনার প্রতিপক্ষের কেস করছি, সুতরাং তাদের ঠকাতে চাই না।

—তারা কি দেয়!

মহাশ্বেতা দেখছে তার বাবাকে। টাকার খুবই দরকার। মহাশ্বেতা দেখেছে বাবার অন্য উকিল বন্ধুদের। তাদের গাড়ি বাড়ি সবই আছে। ব্যাংক ব্যালান্সও। কিন্তু বাবা সেই সাবেকি পৈতৃক পুরনো এঁদো বাড়িতেই রয়েছে—গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও নেই।

কিন্তু তবু গর্ব হয় মহাশ্বেতার।

বাবা ওই টাকা, অফার ফিরিয়ে দেয় সহজেই। বলে, এ কেসের কোন রায় না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের অফার মেনে নিতে পারি না। নমষ্কার! টাকাটা নিয়ে যান।

ভজহরি করাতি আড়ালে ওৎ পেতে ছিল, বড় পার্টি হাতে আসা মানেই তারও টু পাইস আমদানী হওয়া। কিন্তু উকিলবাবুকে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে দেখে ভজহরি গজগজ করে।

—কি হে! শেখর!

ঢুকছেন হরিনারায়ণবাবু। তিনিও দেখেছেন ব্যাপারটা।

ওই পি. আর. ও.কেও টাকা তুলে নিয়ে যেতে দেখেছেন।

শেখরবাবু চাইল—এসো হরিনারায়ণ।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, না, তোমার মতিগতি দেখছি বদলালো না। সেই একবগ্গাই রয়ে গেলে। এতগুলো টাকা ফেরত দিলে—

শেখর বলে, টাকাটাই কি সব!

হরিনারায়ণ বলেন, ও! তুমি তো এখনও আদর্শ-টাদর্শে বিশ্বাস

কর। কিন্তু সবাই তো করে!

—যে যা করে করুক। টাকার জন্য আদর্শকে নীতিকে বিকিয়ে দিতে পারবো না।

হরিনারায়ণ বলেন, মহাশ্বেতা, মা—চা-টা দাও। তোমার বাবা তো আমার মত আদর্শহীনকে চাও খাওয়াবে না।

মহাশ্বেতা ওই পিতৃবন্ধুকে শ্রদ্ধা করে।

দেখেছে ওঁর বন্ধুপ্রেম। এই পরিবারেরই যেন একজন তিনি। মায়ের অসুখের সময় নিজে এসেছেন চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছেন। বাবার সেই সাধ্যও ছিল না। শেখরবাবু বলতে গেছে। বাধা দেন হরিনারায়ণ—সবতাতে কথা বোলো না শেখর। বিপাশা তোমার স্ত্রী হতে পারে, আমারও সহপাঠী, বন্ধুও।

কিন্তু মাকে বাঁচানো যায়নি।

মহাশ্বেতাই আত্মভোলা, কাজপাগল বাবার ভার, এই সংসারের ভার সব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। কলেজের কৃতি ছাত্রী। এবার অনার্স নিয়ে বি. এ. দিয়েছে। বাবার কাজে সাহায্যও করে।

হরিনারায়ণবাবু এলে এবাড়ির পরিবেশও যেন বদলে যায়, দুটি বয়স্ক মানুষ তখন তাদের ওকালতির কচকচি, ব্যবসার জটিলতা ভুলে সহজ সরল মানুষে পরিণত হয়।

ভিতরের বারান্দায় দাবার ছক পড়ে। আর চাল নিয়ে দুজনে ঝগড়াও বেধে যায়, হরিনারায়ণবাবু সালিশী মানেন মহাশ্বেতাকে।

বলো তো মা ঘোড়ার আড়াই চাল হলে ওর মন্ত্রী তো গন ফট্!

আমি তো চাল তখনও দিই নি।

মহাশ্বেতা চা আনে। দুজনের সন্ধ্যাটা সেদিন যৌবনের হারানো দিনের সন্ধানে কেটে যায়। হরিনারায়ণবাবু শুধান, পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে কবে মা!

মহাশ্বেতা বলে, সঠিক জানি না। সামনের মাসেই বের হবে।

হরিনারায়ণ বলেন, তাহলে এখন বেকার?

শেখরবাবু বলে ওঠে, না, না। আমার সহকারী এখন। কেস-এর সওয়াল জবাবের ড্রাফট নিচ্ছে, টাইপ করছে পিটিশনগুলো। বইপত্র বের করে নজীর তুলে দিচ্ছে। রেজাল্ট বের হলে ওকে এবার ল কলেজে ভর্তি করে দেব। এম. এ. এল-এল-বি একসঙ্গেই করবে।

হরিনারায়ণ চাইলেন বন্ধুর দিকে।

সে কি হে, ওকেও উকিল বানাবে! তোমার মত পাটোয়ারী বুদ্ধিবিহীন নিরামিষ্যি উকিল। অমনি করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে শেখাবে?

শেখর হাসে, ধারা তাইই!

শেখর বলে, আমার আদর্শকে ও যদি মেনে নিয়ে সেইমত চলে জীবনে অন্তত ঠকবে না হরিনারায়ণ।

হরিনারায়ণ বলেন, কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে হে। আদর্শও! আজ জীবনের সব মূল্যবোধকে মানুষ হারাতে বসেছে, তাই আদর্শও আজ অর্থহীন একটা শব্দেই পরিণত হয়েছে। সব-কিছু ধ্যান-ধারণাও বদলে গেছে।

শেখর বলে, এ তোমার ভুল ধারণা হরি। জীবনে এখন সত্য, আদর্শ কিছু আছেই, আর থাকবেও।

মহাশ্বেতা দেখেছে তার বাবাকে।

তার জীবনে এই আদর্শকে সে কাজে পরিণত করে চলেছে প্রতিদিনের কর্মপন্থার মাধ্যমে। মহাশ্বেতা তাই অজানতেই এই কঠিন অভাবের জীবনকেও সহজভাবে মেনে নিয়েছে।

রাত নামে।

শেখরবাবু নিজের কাজের ঘরে বসে শিশিরদের কেসের ফাইন্যাল হিয়ারিং-এর পয়েন্টগুলো নোট করছে, বই-রেফারেন্সগুলো এগিয়ে দেয় মহাশ্বেতা।

শেখরবাবু বলে, তুই কিছু বললি না মা—ওদের পি. আর.ও.কে ফিরিয়ে দিলাম। এতগুলো টাকাও নিলাম না।

মহাশ্বেতা বলে, তুমি ঠিক করেছো বাবা!

খুশী হয় শেখর, বলছিস মা।

হ্যাঁ বাবা! টাকাটাই বড় নয়!

শেখর বলে, ঠিক বলেছিস মা। এই অসহায়, নিঃস্ব মানুষগুলো যেন কেসে জেতে, ন্যায়বিচার পায়। আইনের সাহায্যে তাদের দাবী ফিরে পায়। আমার মনে হয় অনেক পেলাম না। টাকা দিয়ে এর দাম হয় না।

মহাশ্বেতা বলে, তবু দিন তো কোনরকমে চলে যাচ্ছে বাবা!

শেখরবাবু বলে, মনে হয় তোর ওপর অবিচার করছি মা। কত কষ্টে রেখেছি তোকে।

মহাশ্বেতা বলে ওঠে, কষ্ট কি বাবা! পাস করলে আমিও আইন পড়বো। তোমার মত উকিলই হবো।

হঠাৎ খেয়াল হয়—রাত একটা বাজে। মহাশ্বেতা বলে, অনেক রাত হয়েছে বাবা। এবার উঠে পড়ো। কাল কোর্টে দু-তিনটে কেস আছে। শরীরও ভালো যাচ্ছে না তোমার!

শেখরবাবু বলে, এই পয়েন্টগুলো নোট করেই উঠছি মা। সকালে সময় পাবো না।

আদালতেও শেখরবাবুকে বেশ কিছু উকিল ও অন্যরাও সম্মান করে। মানুষ এক জায়গায় এখনও মূল্যবোধকে স্বীকার করে। তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনেই হোক। তারা তা পারে না। কিন্তু যে এই আদর্শকে মেনে চলে তাকে এই মানুষগুলো একেবারে অস্বীকার করতে পারে না।

শেখরবাবুকে তাই অনেকেই ভালোবাসে।

তারা টাকার লোভে যা করতে পারেনি, শেখরবাবু নিঃস্বার্থ ভাবে তাই করছে।

তাই বিচারকরাও তার কেসের গুরুত্ব দেন—তার সওয়াল জবাব শুনতে অনেক উকিলরাও আসে এজলাসে।

গুডস্টার কোম্পানীর কর্মচারীদের কেস আদালতে উঠেছে। কোম্পানীর মালিকপক্ষও এ কেস জেতার জন্য কোর্টের নামী দামী অ্যাডভোকেটদের লাগিয়েছে। কিন্তু শেখর সেন আজ যেন জেতার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়েই এসেছে।

তার আইনের ব্যাখ্যা, আইনের বিশেষ ধারার উল্লেখ, অন্য আদালতে এই ধরনের মামলার রায়ের নজীর তুলে আজ শেখর সেন বিপক্ষের সব যুক্তিকে নস্যাৎ করে চলেছে।

মহাশ্বেতার এখন ছুটি। সেও ক্রমশ কেসগুলোর সম্বন্ধে, আইনের মারপ্যাঁচের লড়াইয়ের মূল ব্যাপারটা কিছু জেনেছে। আজ এসেছে দর্শকের আসনে। শুনছে তার বাবার এই সওয়াল জবাব।

জকে দাঁড়ানো সেই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটারের সব হুকুমগুলো যে অর্থহীন, স্বার্থপ্রণোদিত আর বেআইনী তা প্রমাণ করে চলেছে।

এদিকে সেই অসহায়, কর্মচ্যুত অভাবগ্রস্ত কেরানীর দল সাগ্রহে চেয়ে আছে ন্যায়বিচারের আশায়।

এই সওয়াল জবাব করে চলেছে শেখরবাবু। আজ জয়ী তাকে হতেই হবে—এই অসহায় বঞ্চিত অত্যাচারিত মানুষদের স্বপক্ষে আইনকে আনবেই—হঠাৎ তার চোখের সামনে যেন আদালতের দেওয়ালগুলো নড়ে ওঠে। ঘুরছে যেন সব কিছু। চোখের সামনে নেমে আসে অতল অন্ধকার।

হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে সে।

সারা এজলাসে গোলমাল ওঠে। বিচারকও বিচলিত।

ছুটে আসে ভজহরি—স্যার! স্যার—

মহাশ্বেতাও ছুটে আসে। বাবার জ্ঞানহীন দেহটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। ডাকছে সে, বাবা! বাবা!

কোন সাড়া মেলে না।

জজসাহেব কাকে বলেন, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করুন। কুইক।

শেখরবাবুর জ্ঞান ফেরে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ঠিক পুরোপুরি জ্ঞান নয়—আচ্ছন্নের ভাব তখনও রয়েছে।

মহাশ্বেতা এমন বিপদে পড়বে তা ভাবেনি।

এতদিন ধরে সংসারের চাকাটা মন্থর গতিতে চলছিল। অভাব অভিযোগ ছিল, তবু এমন সমস্যায় তাকে কোন দিনই পড়তে হয়নি। আজ যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে মহাশ্বেতা।

মুহুরী ভজহরি একাই ছুটোছুটি করে।

কিন্তু চিকিৎসা মানেই টাকার শ্রাদ্ধ। টাকার তেমন সংস্থানও নেই।

কিন্তু এগিয়ে আসেন হরিনারায়ণবাবু।

ফোনে খবরটা পান অফিসেই। ভজহরিই হিসেবী লোক। সে জানে এরপর আরও ঝামেলা বাড়বে। তাই হরিনারায়ণবাবুকেই

ফোন করে সে।

মহাশ্বেতা যেন পায়ের তলায় মাটি পায় ওকে দেখে। মেয়েটা এমনিতে খুবই বুদ্ধিমতী, ধীর, স্থির। হরিনারায়ণবাবুও দেখেন এতবড় বিপদে মহাশ্বেতা ভেঙে পড়েনি।

এর মধ্যে হাসপাতালে এসে যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছে বাবার। হরিনারায়ণবাবু বলেন, আর ভেব না মা। এবার আমি দেখছি কি করা যায়।

হরিনারায়ণবাবু তাঁর বন্ধুর অবস্থার কথাও জানেন। জীবনে আদর্শ, পরোপকার এইসব করতে গিয়ে নিজের হারিয়েছে সব। পায়নি কিছুই শেখর। অর্থের প্রাচুর্য তো কোনদিনই ছিল না। তাই হরিনারায়ণবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থা করেন।

দুদিন পর জ্ঞান ফেরে শেখরের।

ডাক্তার বলেন, কোনমতে এ যাত্রা বেঁচে গেছেন কিন্তু মনে হয় একটা দিক প্যারালাইজড হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন থেরাপী, অন্য চিকিৎসা করালে কিছুটা সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবেন হয়তো, কিন্তু কর্মক্ষমতা আর থাকবে না তত।

মহাশ্বেতা এই কঠিন সত্যটা শোনে।

আজ ভাবনায় পড়ে সে।

কিন্তু এমনিতে চাপা ধরনের মেয়ে মহাশ্বেতা। মা মারা যায় কৈশোরে। তারপর থেকে সে একাই সংসার চালিয়েছে। পড়াশোনা করেছে। দেখেছে জীবনের কঠিন নির্মম বাস্তবতাকে।

তাই সহজে ভেঙে পড়ে না।

মুখও খোলে না। ধীর স্থির ভাবে কর্তব্য স্থির করে এগিয়ে যায়।

বাবার এই কঠিন অসুখের খবর শুনে মহাশ্বেতা তাই ভেঙে পড়েনি। বুঝেছে বাবার কাজ করার ক্ষমতাও আর থাকবে না। অথচ জীবনের বোঝা বইতে হবে তাকে।

আর কেউ নেই। মহাশ্বেতাকে এবার এই সংসারের বোঝা, নিজের বোঝাও টানতে হবে।

ক'দিন পর শেখরবাবু কিছুটা সুস্থ হল।

দেখেছে মহাশ্বেতার নীরব সেবা যত্নকে। দেখেছে হরিনারায়ণ কর্মব্যস্ত মানুষ, তবুও অফিসের পর রোজ হাসপাতালে আসেন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থাপত্র, ওষুধের ব্যবস্থাও করে যান।

সেদিন মহাশ্বেতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা খাম দিয়ে বলেন, এটা রেখে দাও মা। দরকারে লাগবে।

মহাশ্বেতা দেখে বেশ কিছু একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল এতে রয়েছে। অবাক হয় সে, এটা—এটার দরকার হবে না কাকাবাবু। হাসপাতাল ওষুধ এসবের খরচা তো দিচ্ছেনই।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, দিচ্ছি, রেখে দাও। সংসারের খরচা তো আছে। তোমার বাবা তো মহাদেব, আদর্শ আর তৃপ্তির নেশায় মশগুল থেকেছে। সংসারে অর্থের যে দরকার তা ভাবলো না কোনদিন।

মহাশ্বেতা বলে, যে ভাবে হোক চালিয়ে নেব—

হরিনারায়ণবাবু বলেন, তা তো নেবেই, নিতেও হবে। আপাতত ক'দিন ঘরে থেকে শেখরকে সুস্থ করো। তোমার বাবাই নয় সে— আমারও একমাত্র বন্ধু।

শেখরবাবুও বুঝেছে ব্যাপারটা।

একটু সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসে। আজ সে প্রায় অথর্ব, পঙ্গু। বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গেছে। কথা কোনরকমে বলতে পারে, তবে মাঝে মাঝে তাও জড়িয়ে যায়।

ভজহরি মহুরীও বুঝেছে তার উকিলবাবু আর কোনদিনই এজলাসে দাঁড়িয়ে ভরাটি গলায় কোর্ট-ঘর কাঁপিয়ে সওয়াল জবাব করতে পারবে না। আদালতে যাতায়াতও করার সাধ্য হবে না। তাই ভজহরিকে এখন অন্য উকিলবাবুর আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে সে এখানে রয়েছে এই পরোপকারী সৎ লোকটির সঙ্গে। তার প্রভূত অর্থ রোজগার হয়নি, কিন্তু ভজহরিকে ঠিক সময়মত মাইনে দিয়েছে শেখরবাবু, বাড়তি রোজগার খুব অত্যাচারমূলক না হলে সে প্রতিবাদ করেনি।

ভজহরি দু পয়সা কামিয়েছে।

এবার সেই পথও বন্ধ। তাই ভজহরি এবার বলে, বাবু! এখন

তো আদালতে যেতে পারছেন না, এদিকে আমারও ঘরসংসার আছে—

কথাটা বুঝেছে শেখরবাবুও। এক হাতে খবরের কাগজটা পড়ছিল কোনমতে ধরে। তার চেম্বারে এখন ধুলো জমছে। আইনের বহু মূল্যবান বই, জার্নাল এখন অযত্নে পড়ে আছে। বেশ কিছু পুরনো নথীপত্রও রয়েছে। এখন এসব তার কাছে অর্থহীন। এই ভজহরিও তা বুঝেছে। শেখরবাবুর কথাটা বলতে বুকে বাজে।

সে স্বপ্ন দেখেছিল মহাশ্বেতাকেও আইন পাস করিয়ে নিজের কাছে রাখবে। তাকে আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে নিজে ওকে এজলাসে সওয়াল জবাব করতে শেখাবে। বিপক্ষ উকিলের দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করে মামলা জিতিয়ে আনতে শেখাবে।

এই মূল্যবান লাইব্রেরী, তার আদর্শ—তার উত্তরাধিকারী করে যাবেন মহাশ্বেতাকে।

কিন্তু এইভাবে তার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তা কোনদিনও তিনি ভাবতে পারেন নি।

আজ ভজহরির কথায় বলে শেখরবাবু, ভেবেছিলাম অনেক কিছু ভজহরি, তোমার দিদিমণিকে উকিল করে তুলবো। তুমিও পাশে থাকবে। কিন্তু সব কোন দিকে তছনছ হয়ে গেল।

ভজহরি বলে, দিদিমণি যদি কোনদিন উকিল হন আমি যেখানেই থাকি চলে আসবো বাবু। এখন ক'টা বছর অন্যত্র কাজ করতে হবে।

হ্যাঁ। বাঁচতে তো হবে। ঠিক আছে যাও। ভালো অ্যাডভোকেটের কাছেই থাকার চেষ্টা করো, তবু শিখতে পারবে কিছু।

ভজহরিও চলে গেল। যেতেই হবে। কারণ তাকেও তো বাঁচতে হবে। এখন বাঁচার, টিকে থাকার সমস্যা নিয়েই অসহায় শেখরবাবু ভাবনায় পড়েছে।

মহাশ্বেতাও জানে বাবার চিন্তার কারণটা। বলে মহাশ্বেতা, এ নিয়ে এত ভাবছো কেন বাবা। দু'একটা অফিসে-স্কুলেও চেষ্টা করছি। এমপ্লয়মেণ্ট অফিসেও নাম লিখিয়েছি। অন্য কোথাও ভালো কাজ না পাই কোন স্কুলে কাজ নিশ্চয়ই পাবো। যেভাবে হোক আমাদের দুজনের ঠিক চলে যাবে বাবা।

শেখরবাবু মেয়ের দিকে চাইল।

আজ তার মনে পড়ে সেই স্বপ্নের কথা। বলেন তিনি, তা নয় মা, আমি ভেবেছিলাম তুই এল-এল-বি পাস করবি। এ্যাডভোকেট হবি। আমি তোকে কাজ শেখাবো। তুই আমার অসমাপ্ত কাজের ভার নিবি। এই গরীব-অসহায়-বঞ্চিত মানুষগুলোর উপর ন্যায়-বিচারের আশ্বাস আনবি। কিন্তু সব স্বপ্ন আমার স্বপ্নই থেকে গেল মা। দুঃখ আমার এইখানেই। আজ বাঁচার জন্য তোকে চাকরির সন্ধান করতে হচ্ছে। বাপ হয়ে কোন আশ্বাসই তোকে দিতে পারিনি।

অসহায় পরাজিত মানুষটা আজ যেন ভেঙে পড়েছে কি দুঃসহ বেদনায়। বলে সে, এক এক সময় কি মনে হয় জানিস মা।

চাইল মহাশ্বেতা বাবার দিকে।

বলে শেখরবাবু, আমি বোধহয় ভুলই করেছি রে। এ যুগে আদর্শ সত্য এসবের কোন মর্যাদা, দাম কিছুই নেই। আমি দুহাতে পয়সা রোজকার করতে পারতাম যদি অন্যায়কে মেনে নিতাম, আদর্শকে বিসর্জন দিতাম তোকে এইভাবে সব হারাতে হতো না। ভুল করেছি মা।

বাবার কথায় মহাশ্বেতার সারা মন কি এক যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে। বলে মহাশ্বেতা, না। না বাবা। ভুল তুমি করোনি। আদর্শ সত্য এখনও মিথ্যা নয় বাবা। সমাজ এখনও বেঁচে আছে একেই অবলম্বন করে। তোমার আদর্শকে আমিও তাই শ্রদ্ধা করি বাবা। এই ন্যায়নীতির জন্য আমিও মুখ বুজে সব সইবো, লড়াই করবো বাবা। দেখবে আমি একদিন তোমার স্বপ্নকে সত্যি করবোই।

বৃদ্ধের চোখে কি এক আশ্বাসের আলো।

দেখছে শেখরবাবু তার মেয়েকে। আজ মনে হয় ভুল সে করেনি। তবু এই নির্মম কঠিন বাস্তবকে সে ভয় করে।

বলে শেখরবাবু, কিন্তু এ সমাজ বড় নিষ্ঠুর মা, বড় কঠিন। একজন মেয়ে হয়ে তুই একা লড়বি কি করে?

মহাশ্বেতা তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বলে, মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কি মানুষ নই বাবা। মেয়েদের কি সমাজে একা মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার নেই?

—তা আছে। কিন্তু এটা আইনে। আসলে স্বার্থপর পুরুষ

সমাজ চিরকাল ধরে মেয়েদের পণ্য বলে জেনেছে। ভোগ্য বলে জেনেছে। তাই তাদের উপর অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে নিজেদের, মেয়েদের ন্যায্য কোন অধিকার দিতে চায়নি।

বাবার কথায় আজ মহাশ্বেতা বলে, কিন্তু দিন বদলেছে বাবা, যুগও। এই দিন বদলের সঙ্গে মেয়েরাও বদলে যাচ্ছে। দেখবে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ঠিক প্রতিষ্ঠা করবেই। এই আদর্শ নিয়েই আমি বাঁচার লড়াই করবো বাবা। আর এই লড়াই আমাকে জিততেই হবে।

হরিনারায়ণবাবু ক'দিন ব্যবসার কাজে কলকাতায় ছিলেন না। কলকাতার কারখানা, ব্যবসা ছাড়াও এবার বোম্বাই শহরেও ব্যবসা, কারখানা বাড়াতে চান। এখানে সরকারও নানাভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাঁকে। তাই হরিনারায়ণবাবু সেখানে গেছেন।

লণ্ডনে রয়েছে চঞ্চল। এবার তার ফাইন্যাল পরীক্ষা সামনে। ফিরে আসবে মাস ছয়েকের মধ্যে।

হরিনারায়ণবাবু হিসেবী লোক। তিনি সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে কারখানা বাড়াবার ব্লুপ্রিণ্ট জমা দিয়েই এসেছেন। চঞ্চল এ কাজেই স্পেশালিষ্ট হয়ে আসছে। সে ফিরলে কাজ এগিয়ে নিতে পারবেন।

ক'দিন বোম্বাই, দিল্লী কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে অফিসের কাজের মধ্যে ডুবে যান হরিনারায়ণবাবু। তবু মনে পড়ে শেখরের কথা।

তাই সেদিন অফিসের পর এসেছেন এ বাড়িতে।

মহাশ্বেতা বলে, কতদিন আসেননি?

শেখর বলে, কাজের মানুষ। অকাজের মানুষের সঙ্গে নষ্ট করার মত সময় ওর কোথায় বল।

হরিনারায়ণ জানান, তা নয়. ক'দিন বোম্বাই, দিল্লীতে আটকে গেছলাম। ফিরে এসেই হাজির হয়েছি। মহাশ্বেতা, চা আনো—আর দাবার ছকটাও।

শেখরবাবুও খুশী হয়, হ্যাঁ, কতদিন বসিনি। হয়ে যাক দু বাজী।

কিন্তু হরিনারায়ণবাবু দেখেন শেখর কেমন আনমনা হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। চালেও ভুল হতে দেখেন হরিনারায়ণ। বলেন, কি ব্যাপার হে শেখর! দাবাও ভুলে যাচ্ছো নাকি! কি যেন চিন্তা করছো!

মলিন বিষন্ন হাসি হেসে বলে শেখর, অন্নচিন্তা হে। অন্নচিন্তা চমৎকারী। এতদিন ওটা ভাবতে হয়নি। কিন্তু আদর্শ সামলাতে গিয়ে এখন বেসামাল হয়ে পড়ছি।

চাইলেন হরিনারায়ণবাবু। বলেন, ডাক্তার ওসব চিন্তা ভাবনা করতে নিষেধ করেছেন—আর তাই করছো?

শেখর বলে, এড়াতে পারি কই। পঙ্গু হয়ে বসে গেলাম, সংসার তো আছে।

মহাশ্বেতা চা নিয়ে এসেছে। হরিনারায়ণবাবু চিনি ছাড়া র চা খান। কখনও লেবু চাও।

মহাশ্বেতা চাটা নামিয়ে বলে, তাই বলুন ওকে কাকাবাবু, আমি তো বলে বলেও পারিনি। সংসার ঠিক চলে যাবে। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরিও পাচ্ছি।

হরিনারায়ণবাবুর এবার খেয়াল হয়। এ কথাটা তো ভাবেননি —ভাবার সময়ও পাননি।

শেখর বলে, শুনছো। ভেবেছিলাম মেয়ে ল পাস করবে। অ্যাডভোকেট হবে। ওরও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন জীবন-সংগ্রামে নেমে পড়তে হচ্ছে কোন ছোট প্রতিষ্ঠানের চাকরি নিয়ে। কি পরিবেশ হবে সেখানে জানি না। কেরানীগিরির সামান্য চাকরি—

হরিনারায়ণবাবু মহাশ্বেতার কথাটা এবার ভাবছেন নতুন করে। শেখরের মেয়েটিকে তিনিও স্নেহ করেন। আবার দেখেছেন মহাশ্বেতা বুদ্ধিমতী। ধীর স্থির। ব্যক্তিত্বও আছে ওর। এই বয়সের আজকালকার মেয়েদেরও দেখেছেন তিনি নানা জায়গায়। কিন্তু তাদের ব্যবহার, চালচলন কথাবার্তায় হতাশই হয়েছেন।

হয়তো তিনি পুরাতন পন্থী। তাই এই মনোভাব।

কিন্তু এতবড় ব্যবসা চালান তিনি। তাই মানুষ চিনতে পারেন। সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছেন মহাশ্বেতাকে।

বলেন হরিনারায়ণবাবু, শেখর, মহাশ্বেতা যদি চাকরিই করতে

চায় আমার ফার্মেই করুক। এখানে যা পাবে তার চেয়ে অনেক বেশীই পাবে আমাদের ফার্মে। আমারও একজন বিশ্বাসী, কর্মঠ পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট দরকার। তুমিই এসো—আর আমিই তোমার ইভনিং ল কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দেব। অফিস থেকে সময়মত বের হয়ে ল কলেজ সেরে বাড়ি ফিরবে।

শেখর দেখছে বন্ধুকে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, কি রাজী মা! আমি তো চাই তুমি এল. এল. বি.-টা পাস করো। নিজে স্বাধীনভাবে তোমার বাবার চেম্বারে বসে আইনব্যবসাই চালাও। আমার অফিসের ল ডিপার্টমেণ্টের কিছু কাজও করতে পারবে।

শেখরবাবু খুশী হয়, তাহলে তো ভালই হয়। মহাশ্বেতা, হরিনারায়ণ ভালো কথাই বলেছে মা!

মহাশ্বেতা বলে, কিন্তু কাকাবাবু আপনার তো বহু গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ। ওসব কি আমি পারবো? যদি না পারি—আপনার অসুবিধে ঘটাবো—সেটা ভাবতেও দুঃখ বোধ হয়।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, না না। ওর জন্য ভেব না। তুমি ঠিক পারবে। ক'দিন দেখেশুনে নেবে। অবশ্য যদি আমার ওখানে কাজ করতে তোমার আপত্তি থাকে তাহলে আলাদা কথা।

মহাশ্বেতা বলে, না না! এ তো আমার সৌভাগ্যই।

শেখর বলে, কেন যাবে না ও!

মহাশ্বেতাও মনে মনে খুশী হয়। এ তবু সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারবে এখানে। তাই চাকরিটা নিয়েছে সে।

হরিনারায়ণবাবু একেবারে সাহেবী কায়দায় অফিস চালান। অফিসের ঠাট-ঠমকও বজায় রেখেছেন। কারণ তিনি জানেন ব্যবসার প্রথম কথা ঠাট-বাট, না হলে অন্য ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন করবে কোন্ ভরসায়।

মহাশ্বেতা প্রথম দিন অফিসে এসে রীতিমত হকচকিয়ে যায়। পার্ক স্ট্রীট এলাকার একটা বড় বাড়ির কয়েকটা ফ্লোর নিয়ে অফিস। বাড়িটাও চৌধুরী এনটারপ্রাইজের নিজের বাড়ি। এদিকে সামনের লনের ওদিকে কার পার্ক। দেশী-বিদেশী গাড়ির ভিড়।

সামনে সুন্দর কাউণ্টারে কয়েকটা ফোন নিয়ে বসে আছে একটি মহিলা—দু-তিনজন উর্দিপরা বেয়ারা।

মহাশ্বেতা গিয়ে জানাতে—সেই মেয়েটি বেয়ারাকে দিয়েই পাঠায় ওকে।

লিফটও রয়েছে। এদিকে বড় পিতলের ঝকঝকে বোর্ডে তাদের বিভিন্ন কোম্পানীর নাম লেখা।

চারতলায় লিফট থেকে নেমে হলের পাশ দিয়ে চলেছে। বড় হলঘরে সাবরন্দী আধুনিক ডিজাইনের চেয়ার টেবিল—ইলেকট্রনিক টাইপ-রাইটার, টেলেক্স মেসিনও রয়েছে। সেখানেও কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে।

বেয়ারা হলের ওদিকে একটা চেম্বারে নিয়ে গেল তাকে। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা।

এয়ারকনডিশন্ড ঘর। উজ্জ্বল ঝলমলে আলোয় দু'তিনটে ভদ্রলোক ফোনে কি কথা বলছে। ওদিকে একটা আধুনিক 'ফাক্স মেসিন' কাজ করে চলেছে। বাইরের মেসেজগুলো ওতে আপনা-আপনি রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

মহাশ্বেতা যেন এক অন্য জগতে এসে পড়েছে।

হরিনারায়ণবাবুর দেখা তখনও পায়নি। বহু দরজা পার হয়ে এসেছে তখনও অদেখা রয়ে গেছেন সেই মানুষটি। যে তাদের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে চিনি ছাড়া বিস্বাদ র লিকার খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার সঙ্গে দাবার চাল নিয়ে যুদ্ধ করেন, সেই মানুষটির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আজ চমকে ওঠে মহাশ্বেতা।

সোফায় বসে আছে, একটি তরুণ এসে বলে, বড় সাহেব আপনাকে ডাকছেন। যান—ওই দিকে ওঁর চেম্বার।

হরিনারায়ণবাবু তখন অফিসের কয়েকজন সেকশন্যাল হেডদের সঙ্গে প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলছিলেন। মহাশ্বেতাকে ঢুকতে দেখে চাইলেন, এসো মহাশ্বেতা! বসো!

তারপর তিনি তাঁর কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীকে কি সব নির্দেশ দিয়ে তাদের বিদায় করে এবার যেন হাল্কা হয়ে বলেন, তাহলে মনস্থির করে ফেলেছো।

মাথা নেড়ে সায় দেয় মহাশ্বেতা, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাকাবাবু বলতে গিয়েও পারে না। কারণ মনে হয় এটা অফিস। বাড়ির পরিচয়টা এখানে অর্থহীনই।

বেল টিপতে সেই পাশের চেম্বারের মোটা মত বয়স্কা মহিলা এসে হাজির হয়।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, মিসেস ডিসুজা, এ মহাশ্বেতা। ওকে পার্সোন্যাল ডেস্কের কাজকর্ম দেখিয়ে দিন। ক'দিন ওকে একটু সাহায্য করবেন। ও ওখানেই কাজ করবে।

একটা কাগজে দামী কলম দিয়ে মহাশ্বেতার নাম। আরও কি কি লিখে বলেন, এটা স্টাফ সেকশনে পাঠিয়ে দেবেন। ওরাই অ্যাকাউণ্টস্‌কে জানিয়ে দেবে।

পরে মহাশ্বেতাকে বলেন, মিসেস ডিসুজাই সব দেখিয়ে দেবেন। কাজ শুরু করো। বেস্ট অব দি লাক্‌।

মহাশ্বেতা মিসেস ডিসুজার সঙ্গে তাদের চেম্বারে এসে বসলো। ডিসুজা তখন বেশ কিছু ফাইল-পত্র বের করে তার নতুন ছাত্রীকে তালিম দিতে শুরু করেছে।

মহাশ্বেতা এমনিতে বুদ্ধিমতী। আর কাজেও তার নিষ্ঠার অভাব নেই। তাছাড়া হরিনারায়ণবাবু নিজে অযাচিতভাবে তাকে এখানে চাকরি দিয়েছেন। মাইনেও বেশ ভদ্রগোছের। ঢুকেই প্রথম মাসেই মাইনের খামটা হাতে নিয়ে অবাক হয়।

তিন হাজার টাকার মতই।

এ তার যোগ্যতার থেকে বেশী। তাই মহাশ্বেতাও চেষ্টা করে তার কাজ দিয়ে অন্তত নিজের সেই দামটাকে প্রতিষ্ঠা করতে।

স্টেনো, টাইপিংও জানে সে।

হরিনারায়ণবাবুও ক্রমশঃ দেখছেন মহাশ্বেতার কর্মদক্ষতার ব্যাপারটা। তার নোট বই-এ হরিনারায়ণবাবুর অফিসের দৈনিক কর্মসূচী, ইনটারভিউ, অফিসিয়াল পার্টি ইত্যাদির খবর রাখে মহাশ্বেতা। দরকারী ফাইলগুলো আগে থেকেই পড়ে রাখে—সেই-ই ব্রিফিং করে দেয় বড় সাহেবকে নিখুঁতভাবে সব ফ্যাক্টস, ফিগারস দিয়ে। ফলে হরিনারায়ণবাবুর সিদ্ধান্ত নিতে, সেইমত নোট, অর্ডার দিতে দেরি হয় না।

আর মহাশ্বেতাই সেই নোটগুলো সর্টহ্যাণ্ডে ঝটপট নিয়ে

নিজেই টাইপ করে এনে দেয়। ফলে কাজও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

মহাশ্বেতাই মনে করিয়ে দেয়, আজ বোম্বেতে লেবার মিনিস্টারকে ফোন করতে হবে একটার সময়।

নিজেই এস-টি-ডি লাইনে ফোন করে নাম্বারটাও ধরে দেয় হরিনারায়ণবাবুকে।

আর চারটে বাজলে হরিনারায়ণবাবু নিজেই তাড়া দেয় মহাশ্বেতাকে।

—চারটে বাজছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে নাও। আজ ক্লাস আছে না?

ঘাড় নাড়ে মহাশ্বেতা। ল' কলেজে ও ভর্তি হয়েছে।

হরিনারায়ণবাবু শুধোন, পড়াশোনা ঠিকমত হচ্ছে তো?

প্রশ্নটা শেখরও করে।

এখন তার সংসারে কিছুটা শান্তি, নিশ্চিন্ততা এসেছে।

মহাশ্বেতা সকালে উঠে কাজের মেয়ের সঙ্গে হাত লাগিয়ে রান্না—বাবার রান্নার বেশীটাই করে নিয়ে বাবাকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে অফিস বের হয়ে যায়।

সেখান থেকে কাজ সেরে কলেজে ক্লাস না থাকলে বাজারপত্র সেরে সন্ধ্যার মুখেই বাড়ি ফেরে। ক্লাস থাকলে কিছু দেরি হয়। বাড়িতে পুরোনা চাকর নিবারণ আছে। সেই শেখরবাবুকে দেখভাল করে।

এখন শেখরবাবু সামান্য চলাফেরা করতে পারে। ক্লাস না থাকলে সন্ধার পর স্নান সেরে মহাশ্বেতা বাবার চেম্বারে এসে বসে। শেখরবাবুও আসে, পড়াশোনা হয়। আইনের অনেক প্রশ্নের সমাধান করিয়ে নেয় মহাশ্বেতা বাবার কাছে।

শেখর বলে, চাকরি ঠিকমত করছিস তো মা!

—হ্যাঁ বাবা!

শেখর বলে, জানি, তুই নিজের কাজ দিয়েই ওখানে নাম পাবি। কোন মুহূর্তেই যেন মনে করে না হরিনারায়ণ যে তোকে সে সাহায্য করছে। তুই সেই কাজের মর্যাদা দিবি মা!

মহাশ্বেতা বলে, হ্যাঁ বাবা।

কোন কোনদিন হরিনারায়ণবাবুও এসে পড়েন।

শেখর শুধায়, তোমার কর্মচারী কাজপত্র কেমন করছে হে!

হরিনারায়ণ চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেন, শেখর, আমি তোমার মত আদর্শ, কর্তব্য, দয়া এসব নিয়ে চলি না। আমি ব্যবসাদার লোক, পয়সার দাম বুঝি। তাই অপাত্রে খরচ করি না। মহাশ্বেতা সত্যি দেখছি আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেসনে ইনডিসপেনসিবল হয়ে উঠেছে। তবে ল'টা ভালো ভাবে পাস করুক!

মনোরমাদেবী এবার খুশি হন।

চার বৎসর পর চঞ্চল তাদের একমাত্র সন্তান বিলেতের পড়া শেষ করে ঘরে ফিরছে।

মনোরমাই ফোনটা ধরে। উচ্ছল কণ্ঠে বলে, চঞ্চলের ফোন!

হরিনারায়ণবাবু ফোনটা ধরে শুধোন, পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

দূর থেকে ইথারে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চঞ্চল বলে, ভালোই হয়েছে বাবা!

—তাহলে কবে ফিরছো?

চঞ্চল জানায়, সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই। কিছুদিন কনটিনেণ্ট ঘুরে তারপর বাড়ি যাবো।

হরিনারায়ণবাবু জানান, জার্মানীতে অবশ্যই যাবে। আমাদের কোলাবরেশন ফার্ম-এ যাবে স্টুটগার্টে। ওদের কাজকর্মও দেখে আসবে। ওদের ডিজাইনেই আমাদের বিলিংপ্ল্যাণ্ট রেফ্রিজিরেশন-এর বড় কাজ করতে হবে বোম্বাই-এ। আমি চাই ওসব দেখে কিছু প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নিয়ে এসো। কবে পেঁছিবে জার্মানী থেকেই ফোনে জানাবে।

মনোরমা বলে, এতদিন পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরছে। তাতেও আপত্তি! আবার কোন্ মুলুকে পাঠালে তাকে।

হাসেন হরিনারায়ণবাবু, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে চঞ্চলের মা। ব্যবাসাদার মানুষ, বেড়াতে গিয়েও ব্যবসার সন্ধান করি। এসে পড়বে এই মাসের শেষ সপ্তাহেই চঞ্চল। তার আগে আমার অফিসেও ওর চেম্বার বানাতে হবে।

····চঞ্চল বিদেশে থাকলেও তার সেই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে

যোগাযোগ রেখেছিল। চঞ্চল না রাখলেও ওই নরেন বোস, বিমল সেন, প্রকাশ মেহেরার দল মাঝে মাঝে চিঠি দিত। চঞ্চলও উত্তর দিত তাদের।

ওরা এখনও কেউ তেমন কিছু করে না।

নরেন উত্তর কলকাতার কোন নামী বাড়ির ছেলে—এককালে বনেদী বড়লোক, কাপ্তান ছিল ওর পিতৃপুরুষ। বিরাট নাম—চকমিলানো বাড়ি। এহেন বাড়ির সুপুত্র কলেজের তার গোড়াতেই মুখ থুবড়ে যে পড়লো আর উঠলো না। তারপর থেকে বাড়ির রকে গেড়ে বসলো। মুখে হাতি ঘোড়া মারে—আর বন্ধুদের ঘাড়েই চলে। পৈতৃক বাড়িটাও ধসে পড়ছে, ও দেখছে নীরব দর্শকের মত।

বিমল সেনের পরিচয়ও দেবার মত কিছুই নেই! সে টুকটাক বাড়ি জমি বিক্রীর দালালি করে আর তার বাড়িতে জুয়ার বোর্ড বসিয়ে কিছু দর্শনী পায় মাত্র। তাও মদেই চলে যায়।

সুতরাং টাকার তার খুবই দরকার। মৌজ মস্তির ঘটাও নেই। ওরা পদে পদে এখন চঞ্চলের অভাবই বোধ করে।

ওদের দলে ইদানীং এসে জুটেছে প্রকাশ মেহেরা।

এখানেই মানুষ। নানা কর্ম নিয়ে টুপাইস দমকা রোজকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বোম্বাই-এ পাড়ি দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর সেখানে কোন রিস্তাদারের আশ্রয়ে থেকে পায়ের তলায় মাটি পাবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তার টান ওই মদ ঠাররা এইসব বস্তু আরও নানা কিছুর দিকে তাই বেশী দূর আর এগোতে পারেনি। রিস্তাদার ভদ্রলোকও এবার প্রকাশ মেহেরার যথার্থ পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখে একদিন সাফ জানিয়ে দেয়, এখান থেকে কেটে পড়ো এবার। নাহলে সরে যাও এ বাড়ি থেকে।

প্রকাশও সরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করে সরে আসে। ফিরে আসে কলকাতাতেই। এখন বেকার, তবে সবাইকে বলে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট-এর কাজ করে। এবার শীগগিরই আমেরিকা পাড়ি দেবে।

নরেন বলে, তার চেয়ে চাঁদে পাড়ি দে প্রকাশ!

বিমল বলে, এবার পথেই বসতে না হয়।

এমনি দিনে খবর আসে চঞ্চল ফিরে আসছে।

খবরটা নরেনই দেয়। বলে, সুখবর দিলাম। গলা ভেজাবার ব্যবস্থা কর্।

বিমল বলে, এখন তো পকেট গড়ের মাঠ। চঞ্চলকে আসতে দে, তারপর দেখবি যা গলা ভিজিয়ে দেব না—একেবারে শুইয়ে দেব মাল খাইয়ে! বিলিতী মদ।

প্রকাশ মেহেরা শুধোয়, কবে আসছে বস্?

নরেন বলে, শনিবার বিকেলেই আসছে ফ্লাইট।

মহাশ্বেতা এর মধ্যে অফিসে নিজের একটা ঠাঁই করে নিয়েছে।

নানা ফাইলের বিষয়বস্তু তাতে কর্তাদের নোট, এসবও তার জানা। সেকশন্যাল ম্যানেজাররাই এখন ওর কাছে আসে নানা ফাইল নিয়ে আলোচনা করতে। বড় সাহেবের কাছে এসব নিয়ে আলোচনা করার আগে তারা মহাশ্বেতার কাছে সবকিছুর ব্রিফিং নিয়ে যায়।

মিসেস ডিসুজা বলে, মহাশ্বেতা, তুমি তো দেখছি মুভিং এনসাইক্লোপিডিয়া হয়ে উঠেছো!

পরক্ষণেই ইনটারকম বেজে ওঠে।

সেটা তুলে মিসেস ডিসুজা বলে, বড় সাহেব ডাকছেন, বোম্বাই-এর ওয়ার্ক্স-এর ফাইল নিয়ে যেতে বললেন।

মহাশ্বেতা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ওদিকের পুরনো দুটো চেম্বারকে ভেঙে নতুন করে একটা চেম্বার গড়ে উঠছে। চীনা মিস্ত্রীরা কাজ করছে। দামী টিক—আরও অন্য কাঠ, গ্রেনেড দামী সানমাইকা এসব দিয়ে তৈরী হয়েছে চেম্বার। এয়ারকনডিশনড করা হয়েছে।

আসছে পারসিয়ান কার্পেট, দামী ফার্নিচার!

মিসেস ডিসুজা বলে, অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টার-এর পোস্ট সিফট করা হয়েছে। তিনি ওখানেই বসবেন। এবার কাজের চাপ আরও বাড়বে!

ক'দিন এই নিয়ে অফিসে আলোচনাও চলে। এ সাহেব কেমন হবে কে জানে! এ নাকি খাস বিলেত থেকে আসছেন। এই বড় সাহেবকে চেনে এরা। সহজে যাওয়াও যায় তার কাছে। কিন্তু নতুন সাহেব একেবারে ইয়ংম্যান। তায় বিলেত থেকে আমদানী।

এ আবার কেমন হবে কে জানে।

অফিসের টাইপ সেকসনের নশীবাবু অফিসের গেজেট।

সে বলে, একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোষর। বুঝলেন, বড় সাহেব যে অপ্রিয় কাজগুলো করতে পারেন না, সেগুলো ছোট সাহেবকে দিয়ে করাবেন। বুঝবেন এই বার মজা!

মহাশ্বেতাও ওই নশীবাবুর কথায় কৌতুক বোধ করে। বলে সে, তাই নাকি?

নশীরামবাবু জর্দাসমেত পানটা মুখে পুরে গালটা টোবলা করে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে, কথাটা মিলিয়ে নেবেন। এই নশীরাম শর্মা যা বলে তা বেদ বাক্যি।' তবে আপনাদের ভয় কি বলুন?

—কেন?

নশীরাম মন্তব্য করে, আপনারা খাস বড়সাহেবের দপ্তরের লোক। আপনাদের সারা অফিস ম্যানেজারই সমীহ করে চলে। মরবো তো আমরাই। তাই ভাবছি—নতুন ছোটসাহেব এলে ঘটা করে একটা রিসেপশনই দিতে হবে। তবু যদি একটু মনটা ভেজে ওর।

দমদম এয়ারপোর্টে গেছে মনোরমা ছেলেকে রিসিভ করতে।

হরিনারায়ণবাবুকেও যেতে হয়েছে। তবু এড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। বাড়িতে বলেন স্ত্রীকে, জরুরী মিটিং আছে। তুমি তো যাচ্ছো—

মনোরমা অবাক হয়, সে কি! এতদিন পর ছেলে ঘরে আসছে তুমি যাবে না তা কি হয়। রাখো তোমার মিটিং—

স্ত্রীর চাপে পড়েই আসতে হয়েছে হরিনারায়ণবাবুকে এয়ার-পোর্টে। অফিসের দু'একজন পুরনো পদস্থ কর্মচারীও এসেছে তাদের নতুন মনিবকে অভ্যর্থনা জানাতে।

লাউঞ্জে লোকজনের ভিড় রয়েছে।

ওই ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় সেই তিন মূর্তিকেও।

নরেন বোস, বিমল সেন, প্রকাশ মেহেরার দলও এসেছে তাদের প্রিয় বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে সস্তায় একটা ফুলের মালা কিনে বাণ্ডিলের সুতো দিয়ে শাল-পাতায় জড়ানো।

দলপতি নরেন বোস ওটা বগলে নিয়ে আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবি

আর ইয়া ধাক্কা দেওয়া মুগোপাড় ধুতি পরে চটি ফটাস ফটাস করে ঘুরছে।

প্রকাশ মেহেরা অবশ্য প্যাণ্ট সার্টই পরেছে।

বিমল সেন গুরু পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে ফুক্ ফুক্ সিগ্রেট টানছে।

ওদিকে লাউঞ্জের মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে—এয়ার ইণ্ডিয়া ফ্লাইট নাম্বার ২২২-এ ফ্রম নিউইয়র্ক ভায়া লণ্ডন ইজ স্ট্যাণ্ডিং ...

লাউঞ্জে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা যায়।

এই তিনমূর্তিও ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়।

চারবছর পর ঘরে ফিরছে চঞ্চল। কলকাতায় নেমে ইমিগ্রেসন চেক করিয়ে কাস্টমস্-এ মালপত্র চেকিং শেষ করে বের হয়ে আসছে লাউঞ্জে। এগিয়ে আসেন হরিনারায়ণবাবু, পিছনে মনোরমা।

মনোরমা দেখছে ছেলেকে ব্যাকুল হয়ে।

মায়ের মন, ছেলেকে দূর দেশে পাঠিয়ে খুবই অশান্তিতে ছিল। ভাবনাও হতো তার। বহু বিচিত্র ভাবনা।

কে জানে হয়তো ছেলে কোন বিদেশিনীকে নিয়েই এসে হাজির হবে। ওখানের মেয়েরাও নাকি খুবই স্বাধীন।

কিন্তু নিশ্চন্ত হয় মনোরমা।

—মা।

ছেলে একাই ফিরেছে। আর যে জড়সড় ছেলেটি সেদিন গিয়েছিল, আজ সেই চঞ্চল একেবারে বদলে গেছে। চেহারায় এসেছে একটা চাকচিক্য। শীতের দেশ, তাই গায়ের রংটাও ফর্সা হয়েছে।

মনোরমা খুশি হয়। চঞ্চল মা-বাবাকে প্রণাম করে।

হরিনারায়ণবাবুও খুশী হন। নাহ্, ছেলে বিদেশে গিয়ে এখানকার রীতিনীতিগুলোকে ভোলেনি।

মনোরমা ওর আশ্রিতাদের মধ্যে সুমিত্রাকে বেশী ভালোবাসে। বয়স্কা মহিলা মনোরমার সমবয়সীই।

বাড়িতে মনোরমার কাজকর্ম সেই-ই করে দেয় আর সঙ্গীও। চঞ্চলকে সুমিত্রাই মানুষ করেছে ছেলেবেলায়। চঞ্চল তাকেও প্রণাম করে।

—কেমন আছো মাসীমা!

সুমিত্রা বলে, ভালো রে। তুই ভালো ছিলি তো বাবা।

অফিসের দু একজন পুরনো স্টাফও এসেছে।

ওরা এগিয়ে আসছে বাইরে গাড়ির দিকে, এমন সময় ভিড় ঠেলে সেই তিন মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইলেন হরিনারায়ণবাবু।

শালপাতার মোড়ক খুলে মালাটা বের করে লম্বা বকের মত লম্বা নরেন হাত বাড়িয়ে চঞ্চলের গলায় মালাটা পরিয়ে বলে, ওয়েলকাম হোম চঞ্চল।

বিমল সেন বলে, ভালো ছিলি তো রে! অ্যাঁ—দেখতে একেবারে সাহেব হয়ে গেছিস যে রে!

প্রকাশ মেহেরা এগিয়ে এসে ঘটা করে হাতে হাত মিলোয়।

হরিনারায়ণবাবু বাধা পেয়ে দেখছেন ওদের।

চঞ্চল অবাক হয়—তোরা!

বিমল বলে, তুই এতদিন পর ঘরে ফিরলি আমরা আসবো না?

প্রকাশ বলে বিবেকের মত, আর ডিটেন করাবো না তোকে। জেটলগ্ হয়ে ফিরছিস। তাহলে সন্ধ্যেয় চলে আয়।

—আজ সন্ধ্যেয়?

নরেন বলে, ও. কে., তাহালে কালই আয় ক্লাবে! সন্ধ্যেয়। বেশ জমিয়ে সেলিব্রেট করা যাবে।

চঞ্চল ওদের বিদায় করে গাড়িতে ওঠে।

মনোরমা দেখছিল এই তিনমূর্তিকে। এদের যেন ঠিক ভালো লাগেনি তার। এদের মুখে যেন কেমন বিশ্রী গন্ধও পেয়েছে সে। আর চেহারায় কেমন রুক্ষু ভাব।

শুধোয় সে, ওরা কারা?

চঞ্চল বলে, আমার কলেজের বন্ধু।

মনোরমা খুশী হয় না। বলে সে, কেমন ধরনের ওরা রে! তোর বন্ধু—অথচ আমাদের চিনতেই চাইল না।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, ছাড়ো তো ওদের কথা। চঞ্চল, এবার তোমার জন্য অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করে রেখেছি। দুদিন রেস্ট নিয়ে এবার কাজে লেগে পড়ো। আমারও বয়স হচ্ছে। এদিকে কারখানা, ব্যবসাও বেড়েছে, একা আর সামলাতে পারছি না।

তোমাকে তাই খুবই দরকার।

মনোরমা বলে, এই কাজ ছাড়া আর কিছুই জানো না তুমি। সবে নেমেছে। এখনও ঘরে পেঁছিলো না। আর কাজের কথা শুরু করলে। এখন ওসব রাখো তো।

হাসেন হরিনারায়ণবাবু। বলেন, বলিনি ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে। ব্যবসাদার লোক ব্যবসার কথাই বলে।

চঞ্চল দেশে ফিরেছে দীর্ঘ চার বছর পর।

চার বছরে কলকাতার অনেক রূপই বদলে গেছে। ফাঁকা জায়গা —যে যেখানে পেরেছে বাড়ি তুলেছে। রাস্তাঘাটে ভিড়ই বেড়েছে। গাড়ি, মানুষের ভিড়। আর পথেঘাটে বেড়েছে ভিখারী, ছিন্নমূল মানুষের ভিড়। যারা বরাবর কলকাতায় আছে তারা এই অধঃ-পতনটাকে প্রতিদিন দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই নজরে পড়ে না। কিন্তু দীর্ঘ ব্যবধানের পর এটা চঞ্চলের নজরে পড়ে।

গাড়ি নিয়ে পরদিন বিকেলে এসেছে সে বন্ধুবান্ধবদের সন্ধানে সেই পুরোনো পাড়ায়। ক্লাব-এর মাঠটা অনেকদিন আগেকার, তাই এটুকু জায়গাই ফাঁকা আছে।

বলে চঞ্চল, শহরের এ কি হাল হয়েছে রে! পথেঘাটে ভিড় আর ভিড়। ঘিঞ্জি, নোংরা।

হাসে নরেন। বলে সে, এ তো আর লণ্ডন নয় সাহেব। ইয়ে কলকাতা হ্যায়!

প্রকাশ বলে, কত দিন জমিয়ে মহফিল হয়নি। শহরে এখন দু'একজন বাইজীও এসেছে খাস লক্ষ্ণৌ মুলুক থেকে। কাজলী বাঈ যা ঠুংরি, গজল গায়! আহা—

চঞ্চল বলে, তা মন্দ নয়। অনেকদিন বিদেশে ঠুংরি, গজল শোনা যায়নি। চল্—তাহলে।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। ওরা খুশীই হয়।

বিমলের এই সব গানে কেমন অ্যালার্জি আছে। এই গান যেন ঝিমিয়ে পড়ার গান। বলে সে, তার চেয়ে চল্ আজকাল পার্ক স্ট্রীটের দু'একটা ঠেকে দারুণ ক্যাবারে হয়। আর মিস্ উলির নাচ দেখলে কোথায় লাগে তোর প্যারিসের মুলারুজ-এর বেলিড্যান্স—

নরেন বলে, তাও হবে। চঞ্চলকে হাল কলকাতার মালও কিছু দেখাতে হবে। এটা কালই হতে পারে। আজ এই ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল দিয়েই উদ্বোধনটা হোক।

চঞ্চল দীর্ঘ চার বছর বিদেশে কাটিয়েছে। অবশ্য গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা সে নয়। বাবার টাকার অভাব নেই—তারও রূপ যৌবন আছে। জীবনকে উপভোগ করার নীতিতে সেও বিশ্বাসী।

তাই লণ্ডনের বেশ কিছু এলাকাতেও যাতায়াত ছিল তার। কিন্তু এমনি দরাজ দিল হয়ে সেখানে মেশা যায় না ইংরেজরা এমনিতে কিছু চাপা ধরনের মানুষ।

বেশী হৈ চৈ পছন্দ করে না তারা। ফূর্তি করবে তাও মেপে-ঝুপে।

আজ তাই বাধামুক্ত চঞ্চল।

এই নাচ গানের পরিবেশে জমে গেছে। আর নরেন বোস, বিমল সেন, প্রকাশরাও এতদিন পর দরাজ দিল বন্ধুকে পেয়ে খুশীতে আকণ্ঠ মদ গিলে বেশ হৈচৈ করে। রাতটা জমে ওঠে।

চঞ্চলও নতুন মুক্তির স্বাদ পায়।

মনোরমার ঘুম আসে না।

রাত্রি হয়। চঞ্চল কলেজে পড়ার সময়ও মাঝে মাঝে রাত করে ফিরতো। আড্ডা জমাতো বন্ধুদের সঙ্গে। মনোরমা মাঝে মাঝে বকাঝাকাও করতো।

আবার এখন কলকাতায় ফিরে চঞ্চল যেন সেই জগতে হারিয়ে যাচ্ছে।

হরিনারায়ণবাবু স্ত্রীকে উঠে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াতে দেখে বলেন, এত ভাবছো কেন? চঞ্চল কোথাও আটকে গেছে। আসবে, শুয়ে পড়ো।

পরপর ক'দিনই চঞ্চলের দেরি হচ্ছে ফিরতে। আর ফিরে রাতের খাবার বাড়িতে খায় না। বলে, খেয়ে এসেছি। গুড নাইট।

মাকে যেন এড়িয়েই চলে যায় নিজের স্যুটে। মনোরমারও এটা নজর এড়ায় না।

স্বামীর কথায় আজ বলে মনোরমা, দেশে ফিরে চঞ্চল এমনি

হৈচৈ করে বেড়াবে ?

হাসেন হরিনারায়ণবাবু। বলেন, দু'একদিন একটু ফাঁকায় হাওয়া খেতে দাও। তারপর তোমার ছেলেকে কাজের জোয়ালে জুড়ে এইসা মোচড় লাগাবো, দেখবে খেজুর গাছ তেলপারা হয়ে যাবে। তখন আবার ওকালতি করতে এসো না।

নীচে গাড়ি থামার শব্দ ওঠে।

দেখা যায় চঞ্চল গেট দিয়ে ঢুকে গাড়িবারান্দার ওদিকে গ্যারেজে গাড়িটা রেখে বাড়িতে ঢুকছে।

মনোরমা এগিয়ে যাবে, স্বামীর ডাকে চাইল, এসে তো গেছে। এত রাতে আর কথা নাই বা বললে, রেস্ট নিতে দাও।

হরিনারায়ণবাবু আধুনিক ধরনের মানুষ, জানেন তার বিলেত-ফেরত কৃতি সন্তান এখন একটু অন্য মাত্রাতেই আছে তাই স্ত্রীকে যেতে নিষেধ করেন।

মনোরমা খুশী হয় না। এই পয়সাওয়ালাদের স্বরূপ সে কিছুটা চেনে। এদের সঙ্গে ঘর করে সেটা জেনেছে।

অবশ্য এ নিয়ে অনুযোগ করেও লাভ নেই জেনে তা করে না। কিন্তু মনে মনে সেটাকে সহ্য করতে পারে না সে।

মনোরমা বলে, ব্যবসার কাজেই লাগাও। আর বয়স হচ্ছে, এবার ছেলের বিয়ে-থার কথাও ভাবো।

হরিনারায়ণবাবু জানেন একেবারে কসে লাগাম টানলে তেজী ঘোড়া বিগড়ে যেতে পারে। তাই রয়ে-বসে কাজ করারই তিনি পক্ষপাতী। প্রথমে ব্যবসার জোয়ালে জুড়ে ওকে সযুত করতে চান!

এর মধ্যে অফিসেও সাড়া পড়ে গেছে নতুন ছোট সাহেবকে নিয়ে। লেডিজ রিটায়ারিং রুমেও আলোচনা হয়। ছেলেদের ক্যানটিনেও নশীরাম ঘোষণা করে, আগামীকালই আসছেন নতুন বস। সুতরাং এবার রিসেপশনের আয়োজন কালই করা হোক।

অনেকেই রাজীও হয়। নশীরাম চাঁদাও তুলতে থাকে। মেয়েদের কাছেও তার অবাধ গতিবিধি। সুতরাং নশীরাম তাদেরও জানায় সুসংবাদটা।

হরিনারায়ণবাবু বন্ধুর এখানে তবু ঠিক রুটিন মতই আসেন। ওঁর সব কাজই একটা নিয়মমত করার অভ্যাস।

শেখর বলে, চঞ্চল ফিরেছে। এবার ওকেও অফিসে বসিয়ে দাও।

হরিনারায়ণ বলেন, তাই দেব হে। এবার ওইই সব ভার বুঝে নিক। আমি নিশ্চিন্ত হই। তুমি কেমন আছো?

শেখর হাসে, ম্লান বিষণ্ণ হাসি। বলে, আর থাকা! আছি মাত্র।

মহাশ্বেতা চা এনেছে। হরিনারায়ণবাবু শুধান, তোমার পড়াশোনা চলছে ঠিকমত?

হ্যাঁ। পরশু থেকে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। তিনদিন—

হরিনারায়ণবাবু বলেন, তাহলে ছুটি নাওনি কেন? তোমার তো দেখি ছুটি অনেক পাওনা আছে।

মহাশ্বেতা বলে, না গেলে অফিসের অসুবিধে হবে।

হাসেন হরিনারায়ণ, কেমন কর্তব্যপরায়ণা দেখেছো শেখর—না! না! কাজের সময় ছুটি নেবে বৈকি। পরীক্ষার কদিন তো নিতেই হবে। পড়াশোনাটাও করতে হবে ঠিকমতো। কাল থেকে যেতে হবে না অফিসে—

মহাশ্বেতার সুবিধাই হবে এতে। তবু বলে সে, এই ফাইলগুলো রেডি করে আমার টেবিলে রেখেছি, কাল বোম্বেতে জবাব দিতে হবে। আর ইমপোর্ট ফাইলে দুটো জরুরী চিঠি আছে, কাল একবার গিয়ে সব বুঝিয়ে দেব।

শেখর বলে, এখানেও অফিস চালু করলে নাকি হে হরিনারায়ণ। এদিকে মন্ত্রী সামলাও। গজের মুখোমুখি পড়েছেন তোমার মন্ত্রী।

চঞ্চলকে নিয়ে এসেছেন হরিনারায়ণবাবু অফিসে। এর মধ্যে নতুন চেম্বারও রেডি। সুন্দর করে সাজানো চেম্বার।

তার জন্য কিছু টাকাও রাখা হয়েছে। হেড অফিসে চঞ্চলকে হরিনারায়ণবাবু পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন বিভিন্ন সেকসনে নিয়ে গিয়ে। এরপর চঞ্চলকে নিয়ে যাবেন কারখানায়। তাকে কারখানাতেও যেতে হবে প্রডাকশন-এর ব্যাপারে।

এর মধ্যে নশীরামের উদ্যোগে রিক্রিয়েশন ক্লাবের স্টাফরা তাদের নতুন বসকে বেশ ঘটা করে রিসেপশন দেয়। মালা—ফুলের তোড়া ছাড়াও স্টাফদের মধ্যে আজ মহাশ্বেতাকে পেয়ে গেছে নশীরাম।

মহাশ্বেতা টুকটাক গানও গায়। এর মধ্যে অফিসে তার কাজের জন্য পরিচিতি যেমন ঘটেছে, গাইয়ে বলেও তেমনি পরিচিতি ঘটে গেছে ওই নশীরামের জন্যই।

বিজয়া সম্মিলনী না হয় অফিসের অন্য অনুষ্ঠানে গান গাইতে হয় তাকে। আজ নশীরাম ধরে, মিস সেন, এসে যখন পড়েছেন তখন আর ছাড়ছি না। আজকের অনুষ্ঠানে গান গাইতেই হবে। নতুন বিলিতী বসকে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতেই হবে।

মহাশ্বেতা মৃদু আপত্তি তোলে।

কিন্তু নশীরাম নাছোড়বান্দা। তাই মহাশ্বেতাকেও যেতে হয়েছে ওই অনুষ্ঠানে। গানও গায় সে।

আজ চঞ্চল কেমন যেন ঝড়ের মধ্যে পড়েছে।

আজ মনে হয় বাবা তার ঘাড়ে বিরাট একটা বোঝাই চাপিয়েছেন। আর এত লোকজন এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। এসবে অভ্যস্ত নয়।

বাবা ও ছেলের ব্যাপার—এগুলো তাকেই এখন থেকে 'ফেস' করাতে চান। তাই সরে গেছেন তিনি।

চঞ্চল চমকে ওঠে নামটা শুনে।

মহাশ্বেতা সেন!

মনে পড়ে দু'একবার বাবার সঙ্গে শেখর কাকার বাড়িতে গেছে ছেলেবেলায়। তখন দেখেছিল মহাশ্বেতাকে। ছোট্ট সুন্দর মেয়েটা— ওর সঙ্গে বিশেষ কথাও কইত না। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। যেন পাকা গিন্নী।

আাই!

চাইত মেয়েটি ডাগর চোখ মেলে। চঞ্চল কিছু বলার না পেয়ে জিব বের করে ভেংচি কাটতো। মেয়েটি জবাব দিত না। সরে যেতো। ও যেন ঝগড়া করাটাকে এড়াতে চায়।

আজ মহাশ্বেতা একেবারে বদলে গেছে।

এত সুন্দর গান গায় তা জানতো না চঞ্চল। তার সুরটা ওই ভিড়ে ঠাসা হলঘরে যেন একটা শান্তির স্পর্শ আনে। চঞ্চল দেখছে ওকে।

কিন্তু সভা শেষ হবার পর আর তাকে খুঁজেও পায় না।

এই অফিসে কাজ করে কি না তাও জানে না চঞ্চল। মনে পড়ে ওই সুরটা।

কিন্তু মহাশ্বেতার দেখা আর পায়নি।

বাড়িতে মায়ের মুখে শুনেছে চঞ্চল শেখরবাবুর অসুস্থতার কথা। মহাশ্বেতা নাকি এ বাড়িতেও আসে মাঝে মাঝে অফিসের কাজে। চঞ্চলের মনে হয় একবার শেখরবাবুর খবর নেবে। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয় না। আর অফিসের ছুটির পর ক্লাব, না হয় বন্ধুদের আড্ডাতেই রাত হয়ে যায়। ওই বন্ধুদের নেশাটাই যেন বেড়ে উঠেছে।

মহাশ্বেতার এবার ফ্যাইন্যাল ইয়ার।

এতাবৎ পরীক্ষায় সে ভালো রেজাল্টই করেছে। মহাশ্বেতার রক্তে যেন আইনের জ্ঞান সহজাত। আইনের ধারা-উপধারাগুলো তার কাছে সহজ হয়েই ধরা পড়ে।

শেখরবাবু বলে, হবে না মা, আইন তোর রক্তে। এবার ফাইনাল পরীক্ষার বৎসর ভালো রেজাল্ট করতে হবে মা!

ক'দিন পর অফিসে গেছে মহাশ্বেতা।

হরিনারায়ণবাবুর চেম্বারে যেতে বলেন তিনি, এসেছো! পরীক্ষা কেমন হলো?

ভালোই।

উঁহু। হরিনারায়ণবাবু বলেন, বোম্বাই ফ্যাক্টরী এক্সটেনসন ফাইলটা নিয়ে এসো—

হরিনারায়ণবাবু এবার নিজেই ডিকটেশন দিয়ে যান। মহাশ্বেতা নোট নিয়ে বলে, টাইপ করে আনছি, আপনি সই করবেন তো?

হরিনারায়ণবাবু বলেন, না না, আমি নই, সই করবেন তোমাদের নতুন এক্সকিউটিভ জুনিয়ার চৌধুরী। অবশ্য ফাইলটা ওকে ব্রিফিং করে দিও তুমি। ও যেন এটা নিজেও দেখে নেয়। এরপর থেকে ওকেই এটা দেখতে হবে।

নিজের চেম্বারে এসে টাইপ করছে মহাশ্বেতা।

মিসেস ডিসুজার ডাকে চাইল।

জুনিয়ার চৌধুরী তোমার বাবার কনসার্নের ফাইলে কি কড়া নোট দিয়েছেন দ্যাখো। তিনি চান না ওদের শেয়ার চড়া দামে

আমরা কিনি !

মহাশ্বেতা এই কেসটা নিয়ে হরিনারায়ণবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল। বাবার কনসার্ন তাদের ফ্যাক্টরীতে বিশেষ ধরনের অ্যালয় পাইপ তৈরী করে আর তার চাহিদা আরব মুলুকে খুব বেশী। হরিনারায়ণবাবুরাও সেই প্রডাকশনে নেমেছেন, কিন্তু ওদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না।

ওদের মাল অনেক সেরা। আর তারা ইচ্ছা করে চৌধুরী এণ্টারপ্রাইজের মাল নিজেরা কিনে সেগুলো আটকে দিয়ে নিজেদের মালই চালাচ্ছে নিজেদের ছাপ মেরে।

ডিসুজা বলে, তুমি একবার যাও ছোট সাহেবের কাছে মহাশ্বেতা। হ্যাড এ ডিসকাসন্।

চঞ্চল কয়েকটা ব্লুপ্রিণ্ট দেখতে ব্যস্ত।

মে আই কাম ইন !

কার ডাক শুনে চাইল চঞ্চল, কাম ইন্ !

মহাশ্বেতা এগিয়ে আসে, চঞ্চল দেখছে ওকে। ওর সেই গানের সুরটা মনে পড়ে।

বসুন !

মহাশ্বেতা বোম্বাই-এর ফাইলটা ওকে দেখিয়ে সব কেসটা বলে যায় পরিষ্কারভাবে, মায় মহারাষ্ট্র সরকারের চিঠির সারাংশ, এদের চিঠির জবাব, সব পয়েণ্টস। তারপর জানায়, বড়সাহেব এই লাইনে নোট দিয়েছেন, জবাব দিয়েছেন এরপর থেকে এই ফাইল আপনিই দেখবেন বললেন উনি। তবে এই চিঠিটা সই করতে পারেন।

আপনি বলছেন ?

চঞ্চল আপনিই বলে। কারণ পূর্বপরিচিতি খুব একটা ঘনিষ্ঠ নয় যে তুমি বলবে।

মহাশ্বেতা বলে, হ্যাঁ।

চঞ্চল বলে, এসব ল' পয়েণ্ট আমার মনে থাকবে না। আমি লেখাপড়া জানা মিস্ত্রী ছাড়া কিছু নই, সুতরাং এ বিষয়ে আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে।

মহাশ্বেতা বলে, তা পাবেন। আর এই ফাইলটা—

চঞ্চল বলে, বাবার কনসার্ন-এর শেয়ার কিনতে হবে কেন ?

মহাশ্বেতা জানায় সব ইতিহাসটা। বলে সে, ওরা আমাদের একদম বাজারে আসতে দেবে না। এখন ওদের টাকার দরকার। চড়া দামেও ওদের মেজর শেয়ার নানা নামে কিনে আমরা পরে ওদের কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট হাতে পেতে চাই। যাতে ওই অ্যালয় পাইপে আমরাই একচেটিয়া বিজনেস করতে পারি। আর পেলে তার আউটটার্ন হবে কয়েক কোটি টাকা বছরে।

চঞ্চল দেখছে মহাশ্বেতাকে।

ওদের শেষ করতে চান!

মহাশ্বেতা বলে, না। নিজেরা বাঁচতে চাই। ধরুন যাকে বলে স্ট্রাগল ফর একজিসট্যান্স!

বড়সাহেব এটা জানেন?

মহাশ্বেতা বলে, আমি রাজী করিয়েছি তাঁকে। অবশ্য আপনি যদি রাজী না থাকেন বলার কিছু নেই। তবে এইটাই হবে অ্যালয় পাইপকে বড় করার একমাত্র পথ। আমার তাই মনে হয়।

চঞ্চল দেখছে তেজস্বিনী মেয়েটিকে।

কোম্পানীর হাই লেভেল পলিসি—ব্যবসার রীতিনীতি সম্বন্ধেও ওর একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। বলে চঞ্চল, ফাইলটা রেখে যান, পরে দেখছি।

কাজ নিয়ে দিন কেটে যায় চঞ্চলের। মনে হয়েছে মহাশ্বেতাকে দেখে মেয়েটির কঠিন ব্যক্তিত্ব আর স্বচ্ছ দৃষ্টিও আছে। এত সহজে এতবড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। চঞ্চলও কি ভেবে এবার তার মত বদলে এই আপার কনসার্ন-এর অ্যালয় পাইপের শেয়ার বাজার থেকে কিনতে বলে। মনে হয় এ যেন একটা নিষ্ঠুর খেলাই—দেখা যাক এর শেষ কোথায়!

দিনভোর কাজে ডুবে থাকে চঞ্চল। লোকজনের আনাগোনাও আছে চেম্বারে। নানা ধরনের ব্যবসায়ী, সেলসম্যান, কর্তাব্যক্তি অনেকেই আসেন। চঞ্চলের খাস বেয়ারা গৌর তাদের জন্য কফি কোল্ড ড্রিংকস যোগাতে [illegible]

এসে বাসা বেঁধেছে।

গৌর তাদেরই একজন। থাকে ওই বাড়ির পেছনের ব্যারাক বাড়িতে। সুমিত্রার একমাত্র ছেলে।

গৌর চাকরিও পেয়েছে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি। তবে সৎ, পরিশ্রমী। ড্রাইভিংও জানে। চঞ্চলের গাড়ি চালায়। কিন্তু প্রায়ই চঞ্চল অফিস থেকে নিজেই গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

মহাশ্বেতাও চেনে গৌরকে।

অন্য সেকশনে কাজ করতো গৌর। চঞ্চল আসতে তার খাস বেয়ারা করে আনা হয় এখানে।

মহাশ্বেতা কাজে ব্যস্ত। গৌরকে দেখে বলে, বাইরে যাচ্ছ?

গৌর বলে, আর বলবেন না দিদি—ত্যানারা এসেছেন। সেই তিন মূর্তি! মিঠে পান আনতে হবে! বাবুদের এসব পানে হবে না!

মহাশ্বেতা দেখেছে ওই তিনজনকে চঞ্চলের অফিসেও আসতে। লক্কা পায়রার মত সেজে আসে—হাতে কোঁচা ধরে যেন জামাই আসছে।

গল্পও চলে।

ফোন বাজে। চঞ্চল ফোনে কথা বলে, এরা তিনজন হো হো করে হাসে।

মহাশ্বেতা সেদিন ওর চেম্বারে ছিল। বলে, উনি ট্রাঙ্ক লাইনে বাইরে কথা বলছেন—একটু আস্তে কথা বলুন! প্লীজ!

নরেন যেন ধমকই খেয়েছে। হাসি থামিয়ে গুম হয়ে যায়।

চঞ্চল ফোন সেরে মহাশ্বেতাকে ফাইলটা দিতে সে বের হয়ে আসে।

নরেন বলে, তোর ওই পি-এ মেয়েটার খুব ডাঁট দেখি! তোর বন্ধু আমরা। ওর বসের বন্ধু, তাদেরও ডাঁটসে, আস্তে কথা বলুন!

চঞ্চল বলে, ও অমনিই। যেতে দে।

বিমল সেন বলে, মেয়েদের মাথায় তুলিস না। তায় মাইনে করা চাকর বই তো নয়।

গৌর ততক্ষণে কোল্ড ড্রিংকস, মিঠে পান এনেছে।

প্রকাশ মেহেরা বলে, বস! আর বের হতে কত দেরী। ওদিকে

আজ কাজরী বাঈ-এর মহফিল রেডি করে এসেছি। যা ঠুংরী গায়—সেঁইয়া!

অফিসেই প্রকাশ চোখ ঘুরিয়ে, হাতের ইশারায় ভাও দিয়ে ঠুংরী শুরু করে। ফোনটা বাজছে।

চঞ্চল বলে, এখন থাম।

গৌর ওদিক থেকে ব্যাপারটা দেখছে। এই তিন মূর্তি এখানে কি করতে আসে তাও বুঝেছে। চঞ্চলের টাকাও যে বেশ কিছু যায় তাও বুঝেছে। কিন্তু আদার ব্যাপারী সে, জাহাজের খবর রাখার দরকার নেই। তবু গৌরের ভালো লাগে না ওই তিন মূর্তিকে।

নামগুলোও জেনেছে ওদের। আর জেনেছে ওরা কিছুই করে না কেউ। চঞ্চলের ঘাড়েই ওরা চেপে বসে আছে।

গৌরের মনে হয়, ওদের ঘাড় ধরে বের করে দেবে। কিন্তু চঞ্চলের জন্যই পারে না।

মনোরমা এই সংসারের কর্ত্রী। কিন্তু তার কর্তৃত্বপনায় দাম্ভিকতা নেই। বাড়ির আশ্রিতদেরও সে স্নেহের চোখেই দেখে। আর তাদের জন্য যা করা হয় সেটাও কম নয়। কিন্তু এ নিয়ে কোন কথাই সে কোনদিন বলেনি।

হরিনারায়ণবাবু অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যার পরই।

দু'একদিন শেখরবাবুর বাড়ি গেলে কিছু দেরি হয়। তাও সপ্তাহে দু'একদিন।

কিন্তু চঞ্চলের এখন রাত হয় ফিরতে। আর দু'একদিন ফেরে তখন যেন কেমন চেহারাটা থমথমে।

মনোরমার মনে কি ভয় জাগে!

গৌর মাসীমাকে খুবই সমীহ করে। গৌর জানে ওই মাসীমাই তাদের আশ্রয় দিয়েছে। না হলে তার মা ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে কোন্ অতলে হারিয়ে যেত।

মনোরমা গৌরকে চঞ্চলের সঙ্গে রাখতে চেয়েছিল ইচ্ছে করেই। তাই শুধোয় তাকে, চঞ্চল বিকেলে কোথায় যায় রে!

গৌরও যেন খবরটা দেবার জন্য উসখুস করছিল। বলে সে, আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে ও নিজে গাড়ি নিয়ে বের হয় বন্ধুদের সঙ্গে।

বন্ধুদের সঙ্গে !

মনোরমার কথায় গৌর জানায়, হ্যাঁ। তিনটে বাঁদর এসে জোটে। ওদের ভাবগতিক সুবিধার বুঝি না মাসীমা। চঞ্চলদার ঘাড়েই ওরা খায়। আর চঞ্চলদাকে নিয়ে এখানে ওখানে গানটানের আসরেও যায়। কোনদিন সাহেবপাড়াতেও যায়-টায়।

মনোরমার বুক কাঁপে অজানা ভয়ে। একমাত্র ছেলের জন্য ভাবনাও হয়। স্বামীকে বলেও কিছু হবে না। তাই মনোরমা এবার নিজেই কথাটা পাড়তে চায়।

চঞ্চল অফিসে সেদিন খবরটা পেয়ে খুশী হয়।

হরিনারায়ণবাবুও ডাকেন তাকে। জানান, আপার কনসার্নের মেজর শেয়ার আমাদের হাতে। আমরাই এবার ওদের টেক ওভার করবো।

ওদের কর্তারাও এবার প্রমাদ গুণে ছুটে এসেছে হরিনারায়ণ-বাবুর কাছে। তারা চায় কিছু কাজ হাতে রাখতে। একটা আপোস করতে।

চঞ্চল আজ মনে মনে মহাশ্বেতার কথা ভাবে। বলে সে, মহাশ্বেতাই এই চালটা দিতে বলেছিল।

হরিনারায়ণ বলেন, তুমি আপত্তি করে দেরি করিয়ে দিলে। তখনই কাজে নামলে আজ গালফ্ কমিটিতে ভাল টাকার মাল পাঠাতে পারতাম। রাদার লেট দ্যান নেভার। এখনই কাজ শুরু করো। ওদের প্রডাকশন এখন বন্ধ আছে। লেবার প্রবলেম। আর্থিক সমস্যার জন্য !

খবরটা মহাশ্বেতাকে জানান হরিনারায়ণবাবু, দারুণ পলিসি বাতলেছিলে মহাশ্বেতা। কোম্পানী তোমার জন্য কিছু করতে চায়। এখন থেকে হাজার টাকা ইনক্রিমেণ্ট আর গাড়িও দেবে তোমাকে।

মহাশ্বেতা বলে, এ আমার কর্তব্য।

তাই তোমার প্রতি কোম্পানীরও কিছু কর্তব্য আছে।

তারপরই বলেন, ল' পড়াশোনা কিন্তু ঠিক মত চালিয়ে যাও। ফার্স্ট ক্লাস তোমাকে পেতেই হবে।

মনোরমা এবার চঞ্চলকে ধরেছে ছুটির দিন।

চঞ্চল অন্য ছুটির দিন বন্ধুদের নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার না হয় অন্য কোথাও চলে যায়। সঙ্গে মেয়েরাও থাকে। নরেন, বিমল জানে শাসালো পার্টি, বড়লোকের ছেলেদের খেয়ালের খবর। তাই সব আয়োজনই থাকে তাদের।

দিনগুলো কি এক স্বপ্নের ঘোরে কেটে যায়।

আজ শরীরটা ভালো নেই।

মাকে ঢুকতে দেখে চাইল চঞ্চল। মনোরমাকে দেখে বিছানায় উঠে বসে চঞ্চল।

কি ব্যাপার!

মা চায়ের কাপটা রেখে বলে, আমি তোর বিয়ের ঠিক করছি বাবা!

বিয়ে! চমকে ওঠে চঞ্চল।

সে ওই বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না। তার কাছে একটি মেয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ার দুর্বলতা এতটুকুও নেই।

বলে চঞ্চল, ওসব করার সময় এখনও আসেনি মা। যখন সময় হবে তোমাকে জানাবো। এখন ওসব চেষ্টা করো না।

মনোরমা দেখছে ছেলেকে।

মায়ের চোখে ছেলের এক অন্য রূপ যেন ফুটে ওঠে। বলে মনোরমা, ওসব কথা বলে এড়াতে চাস নে—

চঞ্চল বলে, ওসব চেষ্টা করো না মা!

মনোরমা কথা বাড়ায় না। বের হয়ে আসে।

হরিনারায়ণবাবুও জেনেছেন মনোরমা ব্যর্থ হয়ে এসেছে। বলে সে, ছেলেকে আমি তো বলে পারছি না। এখানে ওর সেইসব বাজে বন্ধু যাদের এয়ারপোর্টে দেখেছিলে তারা জুটেছে। রোজ রাতে ওদের সঙ্গে বের হয় এখানে ওখানে।

হরিনারায়ণবাবু কি ভাবছেন?

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ তাঁর কাছেও এমনি কিছু খবর এসেছে। আর একটা নামী বিজনেস হাউসের মালিকের পক্ষে এটা তেমন গৌরবের নয়। তাই এবার তিনিও ভাবছেন কথাটা।

মনোরমা বলে, আমি পারিনি ওকে বিয়েতে রাজী করাতে। বিয়ে

থা করলে হয়তো পথে আসতো। কিন্তু তা করবে না।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, কাউকে ভালোটালো বাসে তোমার ছেলে? বলো না—তাই যদি হয় জাতপাতও মানবো না আমরা। ও বিয়ে করুক—আমাদের অমত হবে না।

মনোরমা বলে, তাও তো কিছু বলে না। ওই এক কথা বলে বিয়ে-ফিয়ে করবো না। গৌরও বলছিল ওর সেই বন্ধুরা অফিসেও আসে যখন তখন। সন্ধ্যার পর ওদের সঙ্গেই বের হয়। ক্লাবেও যায় না। ওই হতভাগারাই ওর মাথাটা বিগড়েছে।

হরিনারায়ণবাবুরও মনে হয় কথাটা সত্যি। তাই একটা সমাধানের পথও ভাবেন তিনি। আর পথটা সহজেই সামনে এসে যায় তাঁর।

বোম্বাই-এর কারখানার নতুন এক্সটেনসনের কাজে মহারাষ্ট্র সরকার গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে। টাকাও তারা দিচ্ছে। হরিনারায়ণ-বাবু এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না।

তাই এবার বোম্বাই-এর সেই কাজ শুরু করতে চান। আর এই সুযোগে চঞ্চলকেও এখানের বন্ধুবান্ধবদের কবল থেকে মুক্ত করে বোম্বাই-এ পাঠাতে পারবেন।

তাই সেদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলেই কথাটা পাড়েন হরিনারায়ণ-বাবু। সকালে এই কিছুক্ষণ ওঁরা একসঙ্গে বসে চা খান। খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোন।

হরিনারায়ণবাবুর ওই বোম্বাই-এর প্রসঙ্গ শুনে চাইল মনোরমা। হরিনারায়ণবাবু বলেন, চঞ্চল এটা তোমার স্পেশালাইজড জব। আমি তাই বলি, তুমিই বোম্বেতে গিয়ে থেকে এই কারখানার ইনসট্রাকশন কাম প্রডাকশন চালু করে দিতে সাহায্য করো। তোমার ভরসাতেই আমি মহারাষ্ট্র সরকারকে কথা দিয়েছি।

চঞ্চল ভাবছে কথাটা। কলকাতায় বেশ জমিয়েই বসেছে সে। বন্ধুরাও খাসা আরামে, মৌজে আছে। চঞ্চলও।

এমন সময় কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে এই খবরটা শুনে একটু ভাবনায় পড়ে চঞ্চল।

মনোরমাও অবাক হয়। স্বামীর কথায় বলে, এতদিন বাড়িঘর ছেড়ে বিলেতে পড়ে ছিল। ফিরে আসতে না আসতেই আবার ওকে

দেশছাড়া করে ওই বোম্বাই-এ পাঠাবে।

চঞ্চলও ভাবছে কথাটা। জানে সে বহু টাকার প্রজেক্ট। আর তারও দায়িত্ব আছে এতে। চঞ্চল মুখফুটে প্রতিবাদ না করলেও মায়ের কথায় খুশীই হয়।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, বোম্বাই তো দেশের বাইরে নয়। প্লেনে দু'ঘণ্টা, সওয়া-দু'ঘণ্টার পথ। আর এত বড় প্রজেক্ট, এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না চঞ্চল, ভেবে দেখ।

হরিনারায়ণবাবু কথাটা জানান মাত্র। চঞ্চলের কারখানায় যেতে হবে। সে বলে, এখন চলি বাবা। ওবেলায় কথা হবে।

চঞ্চল চলে যেতে হরিনারায়ণবাবু স্ত্রীকে বলেন, তুমি কি চাও ছেলেটা কলকাতায় থেকে ওইসব বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে জাহান্নামে যাক। এদিকে তাকে বিয়েতেও রাজী করাতে পারলে না। ও উড়ে বেড়াবে এখানে। কি বিপদে পড়বে কে জানে। ওর সম্বন্ধে দু'চারটে বাজে কথা আমার কানেও এসেছে। কোম্পানীরও বদনাম হতে পারে এতে। সব দিক বাঁচাবার কথা ভেবে ওকে বোম্বাই-এ পাঠাবার চেষ্টা করছি। সেখানে কাজের মধ্যে ডুবে থাকবে। এসব ভুলে যাবে। চার-ছ' মাস লাগবে সেখানে। হয়তো একেবারে বদলে যাবে। কিন্তু তুমি বাধা দিচ্ছ এতে কেন? তুমি কি ওর ভালো চাও না?

এবার মনোরমাও ব্যাপারটা বুঝতে পারে। হয়তো ঠাঁই নাড়া হলে মতিগতির পরিবর্তন হবে চঞ্চলের। তাই বলে মনোরমা, এসব কথা বলবে তো!

এখন তো শুনলে।

হরিনারায়ণবাবুর কথায় মনোরমা বলে, তাহলে যাক বোম্বাই-এ। দ্যাখো যদি ছেলের মতিগতি বদলায়। আর সেখানের ফ্ল্যাটে একা থাকবে?

না না। ঠাকুর, চাকর, বেয়ারা আছে।

মনোরমা বলে, তা থাক। গৌরকেও সঙ্গে দাও। ওর কাছেই থাকুক গিয়ে গৌর।

হরিনারায়ণবাবু হিসাবী লোক। সব দিক ভেবেই চলেন তিনি। তাই বলেন, পরে যাবে গৌর। আর এ কথাটা চঞ্চল, গৌর কাউকেই বোলো না।

চঞ্চল বেশ বুঝেছে বাবার এই বোম্বাই যাবার প্রস্তাবে তাকে সায় দিতেই হবে।

সেদিন সন্ধ্যার আড্ডায় নরেন,-বিমল, প্রকাশরাও রয়েছে। চঞ্চল জানায়, বাবা আমাকে বোম্বাই-এ কারখানার কাজে পাঠাতে চান।

বেশ তো ঘুরে আয় কদিন, ওরা সায় দেয়।

চঞ্চল বলে, কদিন নয় রে, ক'মাসই থাকতে হবে সেখানে।

অবাক হয় তারা, ক'মাস! বলিস কি রে!

এর আগে ক'বছর চঞ্চল কলকাতায় না থাকার জন্য তাদের কি দুর্দশা হয়েছিল তা জানে তারা। তাই আবার ক'মাসের জন্য এমনি মৌজমস্তির আসর গুটিয়ে যাবার কথা ভেবে তারাও ভাবনায় পড়ে।

নরেন বলে, কোন মতে কাটিয়ে দে। মাকে বল না? যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারে ?

চঞ্চল বলে, বলেছি। কিন্তু চিঁড়ে ভিজছে না। যেতেই হবে।

প্রকাশ মেহেরার চোখে বম্বের স্বপ্ন এখনও ঘোচেনি। বলে সে, বোম্বাই এক সোনার দেশ রে! খাও পিয়ো মৌজ করো। কলকাতায় কি আর আছে। ডেড সিটি। তার তুলনায় বোম্বাই থ্রবিং উইথ লাইফ। সবই মেলে সহজে আর জিনিসও খাসা। সারা ভারতের যা চাইবি পাবি।

নরেন বলে, সেখানে তো তোদের বাংলো আছে, না?

জানায় চঞ্চল, তা আছে। জুহুর ওদিকে বেশ সুন্দর বাংলো। কুক, বয়, বেয়ারা সবই আছে।

বলে নরেন, তাহলে চল না বোম্বাই-এ গিয়েই ক'মাস তাঁবু গাড়ি। এখানে তো দিনভোর বেকার। ওখানে যেতে বাধা নেই। তুই কাজ করবি দিনে। কারখানায় লোহা কাটবি আর রাতে বের হবো বোম্বাই অ্যাট টু নাইট টু মিড নাইট!

প্রকাশ মেহেরা বলে, দারুণ আইডিয়া কিন্তু।

বিমলও বোম্বাই শহরে যায় নি। নামই শুনেছে। বলে সে, কি রে চঞ্চল, এটা করা যায় না? না খরচার কথা ভেবে এমন আইডিয়াটা নস্যাৎ করে দিবি। তোরা অবশ্য আগেই পাউন্ড শিলিং পেন্সের হিসাব কষিস। ব্যবসাদার তো!

চঞ্চলের সম্মানে বন্ধুপ্রীতিতে যেন ঘা লাগে। বলে সে, না না

তা নয় !

নবেন বলে, তাহলে তোর আপত্তি কোথায় ? তোর বাবা অমত করবে ?

খানিকটা তাই-ই মনে হয় চঞ্চলের।

বিমল বলে, জানাবি কেন ? ধর—আমরা বেকার। বোম্বাই-এ চাকরির সন্ধানে গেছি। গিয়ে ক'দিন তোর বাংলোয় রইলাম। এমনও তো হতে পারে !

প্রকাশ বলে, একা একা মুখ বন্ধ করে থাকবি। ইয়ার দোস্ত সঙ্গে থাকলে মোটেই 'বোর' ফিল করবি না। আমার তো সেখানে সব জান পহচান আছে।

কথাটা ভাবছে চঞ্চলও। একা একা বাসাতে হাঁপিয়ে উঠবে। কাজ সে করবে, বাকি সময় তো কাটাতে হবে। আর বাবা তো যাবেন না সেখানে। সুতরাং খবরও আসবে না। বোম্বাই শহরেও মৌজ-মস্তি করা যাবে।

তাই চঞ্চল বলে, ঠিক আছে, আমি তো প্লেনে যাচ্ছি।

বিমল বলে, আমাদের প্লেন লাগবে না। তিনজন আছি—আমার পিসতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী হাওড়ায় বুকিং অফিসে কাজ করে। তিনটে সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই—বোম্বাই গিয়ে হাজির হয়ে যাবো তোর বাংলোয়। ব্যাস।

নরেন বলে, তুই শুধু এইসব খরচা বাবদ মালকড়ি কিছু রেখে যা। দেখবি তুই যাবার পরদিনই পেঁাছে গেছি। ব্যাস—তারপর বোম্বাই আড্ডা শুরু হয়ে যাবে ওখানে। কলকাতাকে তুলে নিয়ে গিয়ে 'কলবোম' এক নতুন মিনি শহর বানিয়ে দেব ক'মাসে।

চঞ্চল এত সহজে বিনা বাধায় বোম্বাই যেতে রাজী হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেননি হরিনারায়ণবাবু।

মহাশ্বেতাও শুনেছে খবরটা। অফিসে পাশেই চঞ্চলের চেম্বার। কিছু ফাইলপত্র নিয়ে গেছে মহাশ্বেতা ওর চেম্বারে।

সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বলে মহাশ্বেতা, ক'মাস আপনাকে মিস্ করবো আমরা।

চঞ্চল দেখছে ওকে। সৌম্য শান্ত মেয়েটি। একটা মার্জিত রুচির ছাপ ওর মুখে চোখে। চঞ্চল বলে, আমারও অসুবিধে হবে।

কেন ?

চঞ্চল বলে, সেখানে এমনি মুভিং এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ ফাইলস্ তো পাবো না। আমার মেমারি আবার খুবই 'সর্ট' ফলে কি হতে কি হবে কে জানে। এখানে তবু আপনি ছিলেন—

মহাশ্বেতা বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। বেস্ট অব দি লাক্।

চঞ্চলকে সেদিন এক আলো ভরা সকালে কলকাতা ছেড়ে প্লেনে উঠতে হলো বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে। মনটা কেমন খারাপই লাগে।

তবু যেতেই হবে।

ঘণ্টা দুয়েকের কিছু বেশী সময় নেয় এয়ারবাসটা। বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমেছে চঞ্চল। এখান থেকে জুহুতে নিজেদের বাংলোয় যাবে।

লাউঞ্জে এসে দেখে একটি তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে তার নামেরই ছোট একটা প্লাকার্ড।

ওয়েটিং ফর মিঃ চঞ্চল চৌধুরী ফ্রম ক্যালকাটা।

চঞ্চল এগিয়ে আসে। নিজের পরিচয় দিতে তরুণ ভদ্রলোক বলে, আমি মিঃ রামনাথন—

চঞ্চলের নাম জানে। অফিস ফাইলে এর নামেই চিঠিপত্র দেয়। রামনাথন ওদের ওয়ার্কস ইনঞ্জিনিয়ার। তারই সমবয়সী। এমনিতে কাজের ছেলে। উৎসাহী, কর্মঠ। বলে রামনাথন, কারখানাতেই যাবেন তো ?

তারা কাজ বোঝে। তাই কাজের কথাই বলে, চঞ্চলও বিদেশে দেখেছে কাজের প্রতি নিষ্ঠাই বড় কথা। কিছুদিন কলকাতার আরাম আয়েস আর ঢিলেঢালা ভাবের মধ্যে থেকে সেও যেন আয়েসী হয়ে উঠেছে।

আব বোম্বাই-এ এসে আবার সেই কাজের বাতাবরণের মধ্যেই পড়েছে তা বুঝেছে সে। কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলায় বিদেশের এই গতির জীবনটা এখানে যার ছায়া পরিষ্কার, সেটা বেশ কিছুটা অনুপস্থিত।

কর্মব্যস্ত শহর বোম্বাই। দাঁড়াবার অবকাশ কারো নেই। গাড়ির সংখ্যাও অনেক বেশী। আর রাস্তাঘাটও ছিমছাম। পরিষ্কার। তাই

বেগেও চলে। আর আইনও মেনে চলে এরা। কলকাতার মত পথচারী বনাম গাড়িওয়ালাদের প্রতিযোগিতা নেই। যানজটও অনেক কম।

চেম্বুর ক্রিক পার হয়ে এদিকে পাহাড়ের সীমা অবধি বিস্তৃত অঞ্চলে গড়ে উঠছে এখন নতুন বোম্বাই-এর এলাকা। ওর ওদিকে সমুদ্র। তাও বুজিয়ে শহর বাড়ছে। কিন্তু সেদিকে বাড়ার গতিকে ছাপিয়ে গেছে মূল ভূখণ্ডের দিকে বাড়ার পরিমাণটা।

এরই একটা অঞ্চলে চৌধুরী এনটারপ্রাইজের কারখানা—ওদিকেও বেশ কিছু পাথুরে অসমতল জায়গা পড়ে ছিল। সেইখানে সমতল করে নতুন কনট্রাকশন হচ্ছে।

ফ্যাক্টরীর আরও কিছু কর্মচারীরাও সমবেত হয় চঞ্চলের কাছে। অফিসটাও এখানে সাজানো।

ওদিকে পুরনো কারখানার প্রডাকশনও পুরোদমে চলছে। রামনাথন ওকে নিয়ে যায় সাইটে। বিভিন্ন ড্রইং, নক্সা, ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়।

লাঞ্চও ওই কারখানার ক্যানটিন থেকেই আসে। রামনাথন এদিকেও মিতব্যায়ী। আর ওদের খাবারও খুবই সাধারণ। বাড়ি থেকে টিফিন-কেরিয়ারে খাবার আনে সে।

সাধারণ ইডলি, সম্বর, কিছু রসম্, আবার তার সঙ্গে ঘোল।

চঞ্চল ক্যানটিন থেকে সামান্য স্যুপ আর ব্রেড দিয়েই লাঞ্চ সারে। প্রাচুর্য আরাম বিলাসকে এরা কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

এখানে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে দেরিতে। ছটাতেও পুরো দিনের আলো থাকে। তাই কাজের সময়টাও যেন এখানে বেশী।

সন্ধ্যায় ফিরছে ওরা বাংলোর দিকে।

অবশ্য রামনাথন কারখানা থেকেই বেয়ারাকে ফোন করেছে চঞ্চলের বাংলোয়। জানিয়ে দিয়েছে ওদের সাহেবের আসার কথাও।

তাই চঞ্চল এসে সব কিছুই হাতের কাছে পায়। রামনাথন ওকে বাংলোয় ছেড়ে চলে গেছে। বিরাট বাংলোয় চঞ্চল একা। দিনভোর খাটুনি গেছে। আর বেশ বুঝেছে চঞ্চল এখানে সবাই কর্মবেশী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে, তাকেও করতে হবে।

মনে পড়ে কলকাতার কথা। এমনি সন্ধ্যায় তাদের পরিক্রমা শুরু হয়। নরেন, বিমলদের কথা মনে পড়ে।

কাজলীবাঈ-এর ছন্দময় লাস্যময় দেহটা যেন চোখের সামনে ঘোরে উজ্জ্বল দীপশিখার মত। মনে পড়ে ক্যাবারে নাচের আসরে উজ্জ্বল আলোয় অর্ধনগ্ন মিস রূপালীর দেহ। আজ সবকিছু থেকে এক নিষ্ঠুর কর্মযজ্ঞের মধ্যে নির্বাসিত হয়েছে।

সকালে উঠতে বেলা হয়ে যায়। বাংলোর বাগানে সবুজ ঘাসের লনে মালি জল দিচ্ছে। দুচারটে পাহ্নপাদব গাছ উঠেছে। আইভি লতার সবুজ বেষ্টনী ঘেরা সীমা প্রাচীর—টবেও বেশ কিছু দিশী-বিদেশী গাছের সমারোহ। ফুলও রয়েছে অনেক।

কিন্তু সময় নেই। স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করেই যেতে হবে কারখানায়। রোদে-ধুলোয় ঘুরতে হবে সাইটে। কনস্ট্রাকশনের কোন খুঁত থাকলে চলবে না। এত দামী বিরাট সব যন্ত্রপাতিও কিছু এসে গেছে, আরও আসছে। তাদের ইনজিনিয়ারদের কাছে কাজ বুঝে নিতে হবে।

ফোনটা বাজছে। তোলে চঞ্চল। কলকাতা থেকে বাবা ফোন করে কারখানার ব্যাপারে রিপোর্ট চাইছে। অর্থাৎ চঞ্চলকে এখানের সব-কিছুর সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। বাবা কলকাতা থেকে প্রায়ই ফোন করবেন আর অফিসে তো কলকাতার সঙ্গে টেলেক্স লাইন আছেই।

দুটো দিন কোনদিকে কেটে যায় জানতে পারে না চঞ্চল। ক্লান্ত ধুলোমাখা অবস্থায় বাংলোয় ফেরে। স্নান সেরে একাই সামান্য দু'-এক পেগ ড্রিংকস নিয়ে বসে।

সেদিন বাংলোয় ফিরে দেখে উপরের ঘরের বাতি জ্বলছে। গেটে ঢুকতে এগিয়ে আসে গৌর। অবাক হয় চঞ্চল, তুই!

গৌর বলে, একা আমিই আসিনি চঞ্চলদা—দ্যাখো তোমার বন্ধুরাও এসেছে।

এসে পড়ে বিমল, নরেন, প্রকাশ।

তোরা!

নরেন-এর সৌখীন নাটক করা অভ্যাস। সে বলে, কলকাতায় চাকরী-বাকরী পেলাম না। তাই ভাবলাম বোম্বায়েই যাই।

বিমল জানায়, তাই চলে এলাম। প্রকাশের অনেক চেনাজানা। ও বল্লো চলো। কিন্তু এসে দেখি থাকার জায়গা এখানে একেবারে নেই। যা দাম চায় পাতি হোটেলে

চঞ্চল বলে, ঠিক আছে। ক'দিন এখানেই থাক। দ্যাখ যদি কোন সুযোগ পাস।

গৌরের থাকার ঠাঁই নীচের ওদিকের ঘরেই নির্দিষ্ট করে চঞ্চল। বন্ধুদের জন্য ব্যবস্থা হোল দোতলার ওদিকের ঘরে।

চঞ্চল বলে, তোরা বোস। স্নান করে আসছি।

গৌর ভাবতে পারেনি যে ওই বন্ধুর দল এখানে এসে জমবে। তাকে মনোরমাই পাঠিয়েছে চঞ্চলকে দেখাশোনা করার জন্য। দরকার হলে তার গাড়িও চালাবে।

কিন্তু ওকে দেখে তাই নরেনরাও একটু সংকোচ বোধ করে। স্নান সেরে চঞ্চল আজ বসেছে বন্ধুদের সঙ্গে মদের বোতল নিয়ে। নরেন বলে, গৌরটা এসে জুটেছে এখানেও।

বিমল বলে, এক কলসী দুধে এক ফোটা চোনা পড়ে গেল। প্রকাশ অবশ্য অনেক খোসামেলা। বলে সে, থাকুক না। বেচারা চাকরি করে বইতো নয়।

চঞ্চল জানায়, ও এদিকে আসবে না। ওকে আমি বলে দেব নে, চিয়াস'।

ওদের মদের আসর শুরু হয়। আর দু'এক পেগ দামী স্কচ পেটে পড়তে মন মেজাজও বদলে যায়। নরেন বলে, থাকুক গৌর। আমরা গৌর নিতাই হয়েই এখানে প্রেম বিতরণ করবো।

বিমল বলে, প্রকাশ, কোথায় সেই দারুণ ক্যাবারে নাচ হয়—শেষ অবধি সব মুক্ত হয়ে যায় বলছিলি না। সেখানে নিয়ে চল একদিন। চঞ্চলকেও দেখা।

প্রকাশ বলে, এনি ডে! চল না কালই যাবো। শনিবার আছে। চঞ্চলও রবিবার ফ্রি থাকবে।

চঞ্চল বলে, রবিবারও কারখানায় যেতে হবে রে। বিদেশী ইঞ্জিনিয়াররা আসবে।

নরেন অবাক হয়, সে কিরে! নো হলিডে এখানে! আহা—

তবু তাদের মৌজ ফুর্তিতে বাধা পড়ে না। খানাপিনারও

অভাব নেই।

চঞ্চল ক'দিনেই যেন বদলে গেছে। চারদিকে দেখেছে এরা কাজ করছে। দু'এক পেগ খায় রাতে তা নেশার জন্য নয়—খেয়ালবশেই। আবার সকাল থেকেই কাজে বের হয়ে পড়ে।

এখানে কাজ না করে খাওয়া, ফুর্তি করাটা যেন সামাজিক অপরাধই।

গৌরও সকালে বের হয়ে যায় চঞ্চলকে নিয়ে। কারখানা—হেড অফিস—দু'একটা অন্য কোম্পানীর অফিস, ডকেও যেতে হয়। ফেরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার পর।

চঞ্চলকে দেখেছে গৌর এখানে যেন অন্য মানুষ। এতবড় প্রজেক্টের সব কাজ দেখাশোনা করছে। ভালো লাগে তার।

আর সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে বাংলোয় ফেরে। তারপর তাকে নিয়ে বের হয় ওই নরেনের দল। জুহু থেকে ওরা যায় বোম্বে সিটির এখান ওখানে। কোথায় ক্যাবারে, কোথায় কোন বারে আকণ্ঠ মদ গিলে হৈ চৈ করে ফেরে তখন মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেছে।

গৌর দেখে ওদের ওই অবস্থায় ফিরতে।

নরেনের দলের কাজ নেই। ঘুমোয় বেলা এগারোটা অবধি। উঠে বেয়ারাদের তম্বিহম্বি করে।

চা লাও। ব্রেক ফাস্ট বানাও। ডবল আণ্ডা, টোস্ট, বাটার, ফ্রুটস লাও! ফ্রুট জুস। গণ্ডেপিণ্ডে গিলে ওরা জুহু বীচে না হয় এখান ওখানে ঘোরে। দুপুরে ফিরে বিয়ার নিয়ে বসে আর লাঞ্চ খায় তখন তিনটে।

আর লাঞ্চের সময়ও চাই চিকেন, ফিস! ত্রুটি হলেই গর্জায়—শালার চাকরি খেয়ে দেব। সাহেবও বাঁচাতে পারবে না। এই রান্না হয়েছে! অখাদ্য! মাছ রাঁধতেও জানে না।

হেড বেয়ারা গোবিন্দন এখানের পুরনো লোক। সেই-ই একদিন বলে গৌরকে, গৌরদা, সূর্যের তাতের থেকেও দেখি বালির তাত বেশী।

—কেন? গৌর চাইল ওর দিকে।

গোবিন্দন বলে, সাহেবকে নিয়ে কোন ঝামেলা নেই, সাহেবের ওই দোস্তদের নিয়ে আর পারছি না। যা দিক্ করে। আর মদের

বিল দেখবে ?

বেয়ারার হাতেই সংসার খরচার ভার। বিলটা দেখাতে চমকে ওঠে গৌর। ক'দিনেই হাজার কয়েক টাকার মদ গিলেছে এখানে বসে। বাইরের খরচ তো চঞ্চলের ঘাড়ে।

ওরা নির্লজ্জভাবে গিলছে আর চঞ্চলেরও ক্ষতি করছে।

দেখে গৌর রোজ সকালে চঞ্চলকে উঠে স্নান করে বের হতে হয়। সকালে তখনও রাত্রির অত্যাচারের গ্লানি মুছে যায় না। চঞ্চলের খিদেও থাকে না তখন। ফলে ব্রেক ফাস্ট বলতে এক গ্লাস ফলের রস খেয়েই বের হয়ে যায়।

আর ঘুমের জের চলে গাড়িতেও। গিয়েই সাইটে ওই রোদের মধ্যে কাজে নামতে হয় অন্য ইনজিনিয়ার-সুপারভাইজারদের সঙ্গে।

চঞ্চলের যেন কষ্ট হয়।

সেদিন গৌর বলে, এত রাত জাগো কেন? শরীরের ওপর কি কম ধকল যাচ্ছে!

চঞ্চল বলে, সত্যি! কষ্ট হয় রে!

—তবে যাও কেন?

চঞ্চল অসহায়ের মত বলে, ওরা টেনে নিয়ে যায়।

গৌর জানায়, ওদের কি বলো? ওরা তো এগারোটা অবধি ঘুমোবে। আর দুপুরে খেয়ে ঘুমুবে। মদ গিলবে দিন রাত। ওদের তো আর কোন কাজ নেই—এই করতে এখানে এসেছে। এক মাসে মদ গিলেছে বাংলোয় প্রায় বারো হাজার টাকার। আর যা জুলুম শুরু করেছে এবার বেয়ারা-কুক এরা না পালায়।

চঞ্চলও বুঝছে সেটা। কিন্তু যেন অসহায় সে। বলে, কি করি বল! এসেছে—

গৌর বলে, তাড়াও! ঢের হয়েছে।

চঞ্চল চুপ করে থাকে। যেন ওই ব্যাপারে তার সম্মতিও রয়েছে। কিন্তু অসহায় সে। গৌর বলে, বলো তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিই চঞ্চলদা।

গৌর এমনিতে গোঁয়ার ধরনের। ওটা সে সহজেই পারে। তার মুখেও কিছু আটকায় না। সে শুধু চঞ্চলের জন্য চুপ করে আছে। ওর কথায় চঞ্চল বলে, ওসবে কাজ নেই। সেটা বিশ্রী দেখাবে।

—তাহলে অন্য পথই নিই।

—অন্য পথ? চঞ্চল শুধোয়।

গৌর বলে, সেটাতে গোলমাল হবে না ; সাপও মরবে। লাঠিও ভাঙ্গবে না।

চঞ্চল বলে, যা করবি বুঝে সমঝে করবি। তাড়াতাড়ি মাথা গরম করিস না।

চঞ্চল বলে, তুমিও এবার ওদের সঙ্গে বেরুবে না। যেতে হয় ওরা একাই যাক। কিছু টাকাপয়সাই দিয়ে দিও না হয়। এমনি চলুক —তারপর দেখছি কি করা যায়।

সেদিন কারখানায় লাঞ্চ-এর সময় রামনাথন বলে, বস। আজ একটু সকাল সকাল বের হবো ; মারাঠা মন্দিরে আমাদের সোসাইটির একটা অনুষ্ঠান আছে। দক্ষিণ ভারতের নামী এক নৃত্যগুরুর ছাত্রীর অনুষ্ঠান। আপনিও চলুন না।

চঞ্চল কি ভাবছে। এখানে এসে যেন একঘেয়ে জীবনের চাকায় যুক্ত হয়ে গেছে। রামনাথন বলে, ভালো লাগবে আপনার সেই অনুষ্ঠান। যাবেন? সন্ধ্যায় তো ফ্রিই থাকেন।

রামনাথন জানে না তার বাংলোয় ভূতের উপদ্রবের কথা। আজ যেন ওই নরেনের দলকে এড়াবার একটা সুযোগই পায় সে।

তাই বলে চঞ্চল, ঠিক আছে। তাই চলো।

গৌরও খুশী হয়। তার ওষুধ যেন ধরেছে। গৌর বলে, তাই চলো। আমিও যাবো কিন্তু তা হলে। গাড়ি কোথাও পার্কিং-এর ব্যবস্থা করে নেব।

রামনাথন বলে—গৌরও দেখি কলাসংস্কৃতির ভক্ত। ঠিক আছে, চলো।

দক্ষিণভারতীয়দের বোম্বাই-এর কোন সংস্থা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা রামনাথনকে তারা সবাই চেনে। রামনাথনই তাদের অন্যতম কর্মকর্তা। তাই সমাদর করেই বসালো চঞ্চলকে।

অনুষ্ঠানও শুরু হয়েছে।

চঞ্চল দেখছে মঞ্চে নাচছে একটি মেয়ে—ওদিকে প্রদীপদানে প্রদীপ সাজানো উজ্জ্বল আলোক বিন্দুর মত সঞ্চরণশীল একটি তন্বী সুন্দরী মেয়ে উচ্ছল কখনও সংযত কখনও লাস্যময়ী রূপে

প্রতিভাত। মৃদঙ্গম বেহালা বাজছে ওদিকে নৃত্যগুরুর কণ্ঠে বোল শোনা যায়। ওই ছন্দে তরুণী মেয়েটি সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে নেচে চলেছে।

চঞ্চলের মনে যেন ঝড় ওঠে।

অনেক নাচের আসরে অনুষ্ঠানে গেছে সে। কিন্তু এ যেন কি বিচিত্র অনুভূতি। চঞ্চল স্তব্ধ নির্বাক নিস্পন্দ চাহনিতে দেখছে সেই অনুষ্ঠান।

যেন অন্য জগতে হারিয়ে গেছে সে।

খেয়াল হয় হাততালির শব্দে। এতক্ষণ যেন চঞ্চল কোন স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেছল।

ফিরছে চঞ্চল।

শহরে তখন ভিড় কিছুটা কমেছে। নারকেল বনে হাওয়া কাঁপে —দেখা যায় জুহু বীচের সমুদ্রের মাতন।

সেই বিচিত্র সুর—সেই আলোকবিন্দুর মত নৃত্যরতা মেয়েটির কথা মনে পড়ে। সুগঠিত সুঠাম ছন্দময় দেহ, পিঠে বেণীটা যেন উদ্যত ফণা সর্পিনীর মত কখনও মাথা তোলে আবার শান্ত হয়ে যায়! ওর দেহের শহরে যেন সমুদ্রের মত্ততা।

সারা ছন্দে নারকেল গাছের পাতার আলোড়নের ছন্দ।

চঞ্চল চুপ করে বসে আছে।

গৌর দেখছে ওকে আজ চঞ্চল যেন অনেক বদলে গেছে। সেই বন্ধুদের সঙ্গে মত্ততার ছায়ামাত্র ওর মধ্যে নেই এখন।

নরেন, বিমল, প্রকাশ কোম্পানী আজ বিকেল থেকেই তৈরী হয়েছিল। আজ তাদের প্রোগ্রামও ছিল রকমারি। কোন বারে গিয়ে প্রথম মাল খাবে তারপর যাবে ওরলির কোন হোটেলের ক্যাসিনোতে। মদ্যপান—কিছু রুলোটিতে জুয়া খেলাও হবে। সেখানেই আসবে প্রকাশের আবিষ্কার করা দুটি গোয়েনীজ মেয়ে। ওখান থেকে আবার অন্যত্র।

রাতটা আজ আমেজেই কাটবে।

কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামে, তখনও চঞ্চলের দেখা নেই। চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা—কি ব্যাপার রে। শালা চঞ্চলটা গেল কোথায়?

নরেন বলে, এত তোড়জোড় করলাম—

এখনও দেখা নেই চঞ্চলের। ওরা ঘরবার করে।

বেয়ারাকে মদই আনতে বলে। তবু টেনশান কিছুটা কমবে।

কিন্তু তখনও দেখা নেই চঞ্চলের।

ফেরে তখন এগারোটা বেজে গেছে।

নরেন এগিয়ে আসে. এত দেরি করতে হয়! কত করে মিস গোমেজকে রাজী করালাম—এতক্ষণ হোটেল সাহনীতে এসে গেছে।

প্রকাশ বলে, তৈরী হয়ে নে। আভি বেরুতে হবে!

চঞ্চলের আজ সেই মানসিকতা নেই। বলে সে, আজ খুব টায়ার্ড। কারখানাতে আটকে ছিলাম! তোরাই যা। আমাকে ছেড়ে দে আজ।

গৌর দেখছে ব্যাপারটা নীরবে: বিমল যেন চমকে ওঠে, বাঃ শিবছাড়া যজ্ঞি! তা কি হয় ব্রাদার চল—তৈরী হয়ে নে প্রকাশ তুই বরং ফোন করে আমাদের যেতে দেরি হবে জানিয়ে দে। টেবিল বুক করা আছে।

চঞ্চল আজ যেন ওই উদ্দামতাকে পছন্দ করে না। বলে সে, বলছি আমার মুড নেই। তোরাই যা—

নিজে পার্স খুলে কিছু টাকা নরেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওপরে চলে যায়।

ওরাও অবাক হয়।

এমন ব্যাপার কখনও ঘটেনি। গৌর ব্যাপারটা দেখে নীরবে তার ঘরের দিকে চলে যায়।

নরেন এদের মধ্যে বেশী বুদ্ধি রাখে।

টাকাগুলো হাতে পেতেই পকেটস্থ করে বলে, ব্যাপারটা গড়বড় ঠেকছে। আজ চঞ্চল কেটে পড়লো—মনে হয় ওই গৌরটাই পিনিক দিয়েছে ওকে।

বিমল এই আবিষ্কারে অবাক হয়, বলিস কি রে!

নরেন বলে, এবার দেখছি পিছনে লেগেছে আমাদের। ওর মতলব ভালো বুঝছি না। চঞ্চলকে বিগড়ে না দেয়।

প্রকাশ বলে, ছাড় তো। একবার মিস গোমেজের পাল্লায় পড়তে দে, দেখবি লটকে যাবে। আর আমরাও তালে তাল দিয়ে ঠিক

আমাদের চক্কর চালিয়ে যাবো।

ওরা দেখেছে নরেনকে টাকাটা নিতে। তাই প্রকাশ বলে, মাল-কড়ি তো পেয়ে গেছ ব্রাদার। তবে চলো আমরাই যাই। একটু না বের হলে মুড আসছে না।

বিমলও সায় দেয়, তা সত্যি। চঞ্চলই মেজাজটা বিগড়ে দিল।

চলো—ওরা ট্যাক্সি নিয়েই বের হয়। রাতের বোম্বাই-এ টহল না দিলে ওই মহাত্মাদের চোখে ঘুম আসবে না।

চঞ্চল আজ শান্তিতে ঘুমোতে পারে।

স্বপ্ন দেখে সে কোথায় নীল সাগরের রুপালী বালুচরে চলেছে সে আর ভিনদেশী হরিণনয়না কোন মেয়ে। চোখের চাহনিতে তার নীল সমুদ্রের অজানা রহস্য। হাওয়ায় কাঁপে নারকেল বীথি।

সমুদ্রের ঢেউয়ে জাগে যেন ধ্রুপদী কোন আদিসুর।

মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসে।

চঞ্চল যেন অজানা দেশের কোন পথহারা পথিক আর তার পথের সন্ধান দিতে পারে ওই মেয়েটি।

ডাকছে তাকে।

এগিয়ে যায় চঞ্চল ওই রহস্যময়ীর দিকে। চোখের তারায় আকাশের তারার দীপ্তি।

কাছে, আরও কাছে এগিয়ে যায় চঞ্চল!

হঠাৎ আবিষ্কার করে কেউ নেই। ঢেউয়ের গর্জন—বাতাসের মত্ততা জাগে। চমকে ওঠে চঞ্চল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কি যেন বিচিত্র স্বপ্ন দেখছিল সে। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। ঝড় উঠেছে। দেখা যায় তার ঘর থেকে সমুদ্রের মত্ততা, কানে আসে ঢেউ-এর গর্জন।

সকালে ঘুম ভাঙে। চঞ্চল আজ অনেকটা সুস্থ। ওদিকের ঘরে সেই তিনমূর্তি গড়াগড়ি দিচ্ছে। তখনও মদের নেশা ছোটেনি তাদের। চঞ্চলের মনে হয় ওই ছেলেগুলোকে যেন রাস্তার কোন অকর্মা জীব। ওদের আজ সে ঘৃণা করে।

স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছে। হেড বেয়ারা গোবিন্দন এতদিন সহ্য করেছিল এদের অনেক জুলুম। এবার বলে, ওই সাহেবদের একটু বুঝে সমঝে চলতে বলুন সার!

—কেন !

—এত জুলুম করলে আমি পারবো না। দিনরাত মদ কোথায় যে দিতে পারবো। এত বিল বাড়ছে! না পেলেই ওরা ভাঙচুর করে।

চঞ্চলেরও কথাটা শুনতে খারাপ লাগে। বলে সে, আমি বলবো ওদের।

—তাই বলুন সার। নাহলে আমাকেই এ নোকরী ছেড়ে চলে যেতে হবে। গোবিন্দন আজ তার মতটা পরিষ্কারই জানায়।

গৌর গাড়িতে আসছে। বলে সে, তুমি না বলতে পারো—আমিই বলবো ওদের।

চঞ্চলের তবু ওই ছেলেগুলোর জন্য কোথায় একটু দয়ামায়াও রয়েছে। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে। এতদিনের বন্ধু।

চঞ্চল বলে, তোর পথেই চলছি। দ্যাখ না—ফল নিশ্চয়ই ফলবে।

চঞ্চলের দিন কাটে কাজের মধ্যে। এখানে এসে সেও কাজপাগল হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ফোন করে বাবাকে ও প্রতিদিনের কাজের হিসেব দেয়। হরিনারায়ণবাবুও খুশী হন।

হরিনারায়ণবাবু জানেন চঞ্চলকে। কাজ সেও করতে পারে আর ওর বোম্বাই-এ থাকার ফলে দেখা যায় ফ্যাক্টরীর প্রডাকশনও এখন রেকর্ড করেছে।

কলকাতার অফিসের জীবন একই গতিতে চলেছে।

মহাশ্বেতার জীবনও। তার সামনে এখন অফিসের চিন্তার পাশাপাশি রয়েছে পরীক্ষার চিন্তা।

ক'বছর পড়েছে। তার এমনিতে পড়াশোনার—পরীক্ষার ফল তবু ফাইনাল পরীক্ষার ফলের উপরই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাই মন দিয়ে পড়াশোনা করে। রাত অবধি পড়ে।

শেখরবাবুও দেখেছেন ওর নিষ্ঠা, চেষ্টা। রাত জেগে পড়তে দেখে বলে, মহাশ্বেতা, শরীরের দিকে নজর দে মা। এত খাটুনি—

মহাশ্বেতা বলে, কি এমন খাটি বাবা। ও কিছু নয়।

হরিনারায়ণবাবুও আসেন এ বাড়িতে।

শনিবার দিন তাঁদের দাবার আসর পড়ে।

হরিনারায়ণবাবুও বলেন, ফার্স্ট ক্লাস পেতে হবে মা। তবু জানবো আমার অফিসের একজনও কিছু করতে পেরেছে জীবনে। আর পাস করে আমাদের কেসই করবে প্রথম। অবশ্য তোমাকে কোন লোক ঠকানোর কেস দেব না। আমাদের ঠকিয়েছে তেমনি কেসই দেব।

হাসে মহাশ্বেতা. কেন?

হরিনারায়ণ বলেন, তোমার আদর্শবাদী পিতৃদেব তাহলে আমার মুণ্ডপাত করবে না। ও তো ভাবে আমরাই লোক ঠকাই। কিন্তু তুমি তো দেখেছো আমাদেরও লোকে অন্যায়ভাবে ঠকায়।

মনোরমাও ছেলের সঙ্গে কথা বলে।

গৌরও ফোন করে বোম্বাই থেকে। গৌর এখন খুশী। কারণ সে দেখেছে চঞ্চলদার মধ্যে একটা পরিবর্তনকে।

চঞ্চলদা এখন আর প্রতিদিন কারখানা থেকে বাংলোয় ফেরে না। সন্ধ্যার পর ওই নরেনের দল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চঞ্চলের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু উৎকট বিজাতীয় ভাষা প্রয়োগ করে নিরেবাই তিন মূর্তিতে বের হয়।

আব গৌরের চাপে এখন বেয়ারারাও সাহেবদের যখন-তখন মদ দেয় না। চিকেন বল—ফিস্ ফিংগারও মেলে না।

দুপুরের লাঞ্চের সময় বিরিয়ানী, চিকেন, প্রণ এসবও বন্ধ হয়ে চালু হয়েছে সাধারণ ডাল, ভাত, চাপাটি সব্জী। চিকেন—না হয় ফিস্।

নরেন বলে, চঞ্চলটা দুপুরে খায় না দেখে আমাদের ব্যাটারা এবার একাদশী করাতে শুরু করবে।

বিমল বলে, বেয়ারাটার মেজাজ দেখেছিস! বলে কিনা—এই হয়েছে। এর বেশী আইটেম হবে না!

প্রকাশ বলে, চঞ্চলটাও আর দেখছে না আমাদের। ব্যাটা প্রায় সন্ধ্যায় কোথায় যায়।

নরেন বলে, সত্যিই ভাবার কথা। কেমন যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে আসছে সব। ব্যাপারটা একটু স্টাডি করতে হবে।

বিমল বলে, তাই কর। আমার কেস কেমন গড়বড় ঠেকছে। শেষকালে গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে না তো।

প্রকাশ বলে, আমার সাপ্লাই-এর ব্যবসা জমছিল কলকাতায়, ছেড়ে চলে এলাম।

বিমল বলে, আমার দালালীর ব্যাপারটাও চলছিল ভালোই। এখানে এসে 'নো মানি'—কি হবে বল তো!

নরেন বলে, চেপে বসে থাক। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চঞ্চল ঠিক দাঁড়ে বসবেই।

চঞ্চল সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে বের হয়ে একাই এদিক ওদিকে ঘোরে। বন্ধুদের সেই একঘেয়ে নোংরামি আর মদ গেলা এসবে যেন অরুচি এসে গেছে তার।

সেদিন জুহুবীচের ওদিকে নির্জন বালুচরে বসে আছে চঞ্চল। সন্ধ্যাটা এখানে মনোরম। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়—ওদিকে নারকেল গাছে সেই হাওয়ার আলোড়ন। সমুদ্রের সুর।

কোথায় যেন দূরে কোন ডাগর চোখের স্বপ্ন জাগে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সঞ্চরণশীল একটা আলোকবিন্দুর মত কোন এক মেয়ের লাস্যময়ী মূর্তি। সেই সন্ধ্যায় দেখা মেয়েটিকে যেন ভুলতে পারে না চঞ্চল। বার বার মনে পড়ে তার কথা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পশ্চিম সমুদ্রে সূর্য রংয়ের তুফান তুলে হারিয়ে গেছে। দূরে আইল্যাণ্ডের গাছগুলোও আঁধারে ঢেকে যায়।

উঠে আসছে চঞ্চল।

—স্যার! গুড ইভনিং।

দেখে চঞ্চল সামনে রামনাথনকে।

খেয়াল হয় আজ রবিবার। কারখানাতে যায়নি সে। রামনাথন বলে, এদিকে?

চঞ্চল বলে, একটু হাওয়ায় বসেছিলাম।

রামনাথন বলে, ওদিকেই আমার ফ্ল্যাট। এত কাছে এসে চলে যাবেন তা হয় না স্যার। চলুন, অন্ততঃ এক কাপ কফি খেয়ে যেতেই হবে। প্লিজ?

রামনাথনের অনুরোধ এড়াতে পারে না। তাই চলেছে ওর সঙ্গে।

বালিয়াড়ি ছেড়ে ওরা শহরে ঢুকেছে। ওদিকে দুচারটে পুরোনো বাংলো। বাকী যেখানে সেখানে মাথা তুলেছে হাল ফ্যাসনের বিরাট বিরাট বাড়ি। অর্থের প্রাচুর্যের পরিচয় ওদের সর্বাঙ্গে।

বড় বড় হোটেল গড়ে উঠেছে সমুদ্রের ধারে। আর সেখানে বেশী দাম দিয়ে থাকার লোকেরও অভাব নেই।

এই এলাকার একটু ওদিকে কয়েকটা সোসাইটির বিল্ডিং রয়েছে। দু'তিন রুমের ফ্ল্যাটে এখানে অনেকেই বাসা বেধেছে। তেমনি একটা ফ্ল্যাটে এসে বেল টেপে রামনাথন। চঞ্চলকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

দরজা খুলেছে একটি মেয়ে। হাসি মুখে দরজা খুলে দিয়ে দেখছে সে অতিথিকে।

চঞ্চলও চমকে উঠেছে। সেই দিনের নাচের আসরের সেই স্বপ্নময়ীকে এখানে দেখবে তা ভাবেনি।

তিন রুমের ফ্ল্যাট। বাইরের ঘরটা বসার ঘরের মতই ব্যবহার করা হয় দিনে। রাতে দরকার হলে ওটাকেও বেডরুমে পরিণত করা হতে পারে। ওদিকে মেজের উপর শিতলপাটির মত কি একটা পাতনের উপর বসে আছেন বয়স্ক একটা ভদ্রলোক। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। পাকা চুলের সেই ছাঁটের ঘনত্ব মাথাটাকে ঢেকে আছে। পায়ে সম্মানীয় বালা। দক্ষিণী নৃত্যগুরুদের এভাবে অনেক ছাত্র পাদবন্দনা করে। গলায় পদ্মবীজের মালা। কপালে শ্বেত চন্দনের দাগ।

রামনাথন পরিচয় করিয়ে দেয়. আমাদের শ্রদ্ধেয় নৃত্যগুরু, আমার গ্রামেরই পরম শ্রদ্ধেয় শিল্পী।

আর ইনি আমার বস্ মিঃ চৌধুরী, কলকাতার নাম করা পরিবারের ছেলে।

ভদ্রলোক কলকাতা, পশ্চিমবাংলার নাম শুনে বেশ সমীহ করে বলেন, ক্যালকাটা, পশ্চিমবাংলা তো বহু জ্ঞানী গুণীর দেশ। কলকাতা শহর গুণীর কদর দিতে জানে। ওখানে দু'একবার অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বুঝেছি কতবড় সমঝদার তারা। আবার যাবার ইচ্ছে আছে জয়লক্ষ্মীকে নিয়ে। ওর অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই ওখানের মানুষের ভালো লাগবে।

রামনাথন এর মধ্যে কফির ব্যবস্থা করেছে। কফি আনে মেয়েটিই। পান পাতার মত মুখ। সজীব লালিত্যে ভরা। ডাগর দুটো চোখে কৌতূহলী চাহনি। সুন্দর ছন্দবদ্ধ রূপ। নমস্কারের ভঙ্গিটাও

মনোরম, যেন আত্মনিবেদনের নীরব আকুতিতে ভরা।

রামনাথনই পরিচয় করিয়ে দেয় চঞ্চলের জয়লক্ষ্মীর সঙ্গে।

চঞ্চল দেখছে ওকে। খোঁপায় পরেছে রজনীগন্ধার মালা। খোঁপায় মালা পরা ওদের অভ্যাস।

রামনাথন বলে, মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিরাট কারখানার মালিক। দেখতে ছোট হলে কি হবে, আমার বস্।

সন্ধ্যাটা কোনদিকে কেটে যায়। দক্ষিণের নৃত্যকলার ইতিহাস, দক্ষিণ মন্দির শৈলী, তার পুরাকীর্তি এইসবের আলোচনাই চলে। জয়লক্ষ্মীও এর মধ্যে তার পিতৃদেব নৃত্যগুরুর অনুরোধে সাধারণ শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে 'পাদম্'-এর কয়েকটা দুরূহ ছন্দ শিল্পশৈলী দেখিয়ে দেয়, সঙ্গে মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন নৃত্যগুরু নিজে।

রাত হয়েছে।

চঞ্চল আজকের মত বিদায় নেয়। নৃত্যগুরু বলেন, আবার এসো কিন্তু। ক'দিন অবশ্য আছি এখানে।

জয়লক্ষ্মী ওকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে আসে। জুহুর সমুদ্রে তখন জোয়ার এসেছে। এলোমেলো হাওয়া কাঁপে নারকেল বনে। চাঁদের আলোর ঝলকানি জাগে আকাশে। তারই বিচ্ছুরিত আলো জয়লক্ষ্মীর চোখে মুখে। বলে সে ভাঙ্গা ইংরাজীতে. আবার এলে খুশী হবো। শুভ রাত্রি।

বের হয়ে আসে চঞ্চল। তার সারা মনে কি নীরব সাড়া জাগে। জীবনে তার মেয়ের অভাব হয়নি। দেশে, বিদেশে অনেক মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে। চিনেছে, জেনেছে তাদের।

তাদের সঙ্গে এই জয়লক্ষ্মীর যেন কোন তুলনাই হয় না। এ স্বতন্ত্র, একক—বিচিত্র। সহজভাবেই আলাপ করেছে তার সঙ্গে। ঘরোয়াভাবে নেচেছে। নিজের হাতে কফি দাক্ষিণী বড়াও ভেজে এনেছে। এ যেন অনেক সহজ, ঘরোয়া। অথচ তার চোখের তারায় কোন এক অজানা রহস্যময়তা যা চঞ্চলকে আকর্ষণ করে নিদারুণ ভাবে।

নরেন, বিমল. প্রকাশের দলের আজ রসদ তেমন জোটেনি। বাড়িতে আর গৌরের জন্য মালের বরাদ্দ কমে গেছে। লাঞ্চের বহরও সীমিত। ক্রমশঃ চঞ্চলের এই এড়িয়ে থাকাটায় এবার তাদের

সন্দেহও ঘনীভূত হয়েছে।

আজ তারা বের হতে পারেনি। মালের মাত্রাও কমেছে। বাংলোর বাগানে বসে ছটফট করছে। এমন সময় চঞ্চলকে ফিরতে দেখে চাইল।

নরেন এগিয়ে আসে, হ্যাঁরে, আমাদের একেবারে ভুলে গেলি। একা থাকবি, কলকাতা থেকে সব কাজ ফেলে এলাম তোকে সঙ্গ দিতে আর তুই কাজেই ডুবে রইলি।

চঞ্চল দেখছে ওদের। বলে সে, আর বলিস না। বাবা রোজ ফোন করছে। ক'টা দিন একটু চাপে আছি তারপর ফ্রী হয়ে যাবো।

প্রকাশ বলে, একটু মাল চাইলে তোর বেয়ারা বলে নো স্টক।

চঞ্চল পকেট থেকে শ' পাঁচেক টাকা বের করে বলে, চালা এই দিয়ে। পরে ব্যবস্থা হবে।

ওরা টাকা পেতেই খুশী। চঞ্চলকে নিষ্কৃতি দিয়ে বের হয়ে গেল। বাংলোয় শান্ত পরিবেশ ফিরে আসে।

চঞ্চল বাগানে বসে আছে। মনে পড়ে একটা সুন্দর মুখ, ডাগর চোখের আহ্বান—'আবার আসবেন কিন্তু!'

জয়লক্ষ্মীও বোম্বাই এসে বড় একটা বের হবার সুযোগ পায়নি। সবাই এখানে কর্মব্যস্ত। তাছাড়া বেরুবার সঙ্গীও চাই। তাই পরদিন সকালে চঞ্চলকে আসতে দেখে খুশী হয় সে।

সেদিন কি ছুটির দিন। জয়লক্ষ্মী বলে, বোম্বাই-এ এলাম অথচ দেখা কিছুই হল না। কয়েকটা অনুষ্ঠানই করলাম মাত্র।

চঞ্চল বলে, বেশ তো, চল আমার গাড়িতে। আজ ছুটির দিন ঘোরা যাবে।

দারুণ হবে। জয়লক্ষ্মী খুশিতে যেন ফেটে পড়ে। বলে সে, তুমি অপেক্ষা কর। তৈরী হয়ে আসছি। দেরি হবে না।

চঞ্চল আজ যেন খুশীর হাওয়ায় ভেসে চলেছে। জয়লক্ষ্মীকে মানিয়েছে চমৎকার, কাঞ্জিভরম শাড়ির ময়ূরকণ্ঠ রং ওর ফর্সা রংকে যেন উদ্ভাসিত করেছে। পথে বের হয়ে মোড়ের ওদিকেই বলে ওঠে, থামো—থামো।

চঞ্চল গাড়ি থামায়। উচ্ছল মেয়েটা নেমে গিয়ে ফুলের দোকানে গিয়ে হাজির। একটা মালা কেনে—মিষ্টি গন্ধ ভরা তাজা যুঁই

ফুলের মালা। দাম দিতে যাবে, চঞ্চল বাধা দেয়, আজ তুমি আমার অতিথি। দাম সেই-ই দেয়।

খোঁপায় মালাটা জড়িয়ে গাড়িতে উঠে বলে, দারুণ সুবাস, না!

চঞ্চল দেখছে ওকে। বলে সে, যুঁই ফুলের মালা নিয়ে আমাদের কবিগুরুর একটা গান আছে। চঞ্চল আজ খুশীতে গেয়ে ওঠে—

পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা—
লজ্জা দিও না।

বাংলা সুরটা তার কানে মিষ্টি ঠেকে। ভাষাটা অজানা।

চঞ্চল তার ইংরাজী তর্জমা করে দিতে মুগ্ধকণ্ঠে বলে, জয়লক্ষ্মী দারুণ! সত্যি বাঙালীদের তাই এতবড় শিল্পী মন।

যুঁই ফুলের মালায় তোমাকে যেন সত্যি লক্ষ্মীর মতই দেখাচ্ছে।

যাঃ। সলজ্জভাবে চাইল মেয়েটি।

চঞ্চল বলে, লক্ষ্মী বলেই ডাকব তোমাকে। রাজী তো?

শহরের একপ্রান্তে ন্যাশন্যাল পার্ক ছাড়িয়ে ওরা এসেছে নির্জন বনের পথ পার হয়ে ক্যানারি কেভস্-এ।

কোন দূর শতাব্দী পারে এই পাহাড়ের বুকে খোদিত গুহা ছিল বৌদ্ধদের আশ্রয়, ধর্ম প্রচারের স্থল। আজ সব পরিত্যক্ত কোন স্মৃতিচিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে আছে মাত্র। কিছু দর্শকদের সমাগম ঘটে।

চঞ্চল, লক্ষ্মীও এসেছে। ঘুরছে ওই গুহার এদিক ওদিকে. পাহাড়ের নীচেই ওদিকে লেক।

পাহাড় ঘেরা সবুজ শান্ত পরিবেশ। ওখানে গাছের ছায়ায় কোন রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়া সারে। লক্ষ্মীই খাবার এলে পরিবেশন করে চঞ্চলকে। যেন বহুদিনের কোন চেনা আপনজন তারা। এতকাল দুজনে দুজনকে ছেড়ে ছিল, আজ আবার ফিরে পেয়েছে তারা দুজনকে।

লক্ষ্মী বলে, খাও। আর কি দেব?

চঞ্চল বলে ওঠে, এ যেন নিজের বাড়িতেই খাওয়াচ্ছো আমাকে।

লক্ষ্মী বলে, যাবে তুমি আমাদের গাঁয়ে—শ্রীমেদুরপুরম্-এ?

পাহাড়ের কোলে কাবেরীর ধারে আমাদের গ্রাম। আম-কলাগাছের বাগান, নারকেল-সুপারীর বন ঘেরা সুন্দর গ্রাম। বিরাট গোপুরম-ওয়ালা দেবস্থানম্! খুব ভালো লাগবে তোমার!

দুজনে যেন অনেক স্বপ্ন দেখে। লেকের জলে নৌকোয় ঘুরছে তারা। লক্ষ্মী বলে, আমি নৌকো বাইতে জানি। আর সাঁতার—কাবেরী নদীর ধারে বাস করলে সবাই সাঁতার শিখে নেয়।

চঞ্চল বলে, কলকাতাও গঙ্গার ধারে।

—তাই নাকি! তোমার গঙ্গা—আমার কাবেরী। নদীর ধারের মানুষদের মনও নরম হয়।

হাসে চঞ্চল, তাই নাকি! অবশ্য তোমাকে দেখে তাই মনে হয়। লক্ষ্মী! আজকের দিনটায় তুমি আমার শূন্য মনকে কি স্মৃতি সুধায় ভরে দিয়েছো তা জানো না।

অবাক হয় লক্ষ্মী, তাই নাকি!

চঞ্চল বলে, এখানে একা থাকি। সকাল থেকে রাত অবধি শুকনো ইট কাঠ লোহা লক্কড়ের মধ্যে কাটাতে হয়। তারপরও সেই একা!

লক্ষ্মীর চোখে সমবেদনার ছায়া

ওমা! বাড়িতে কেউ নেই?

হাসে চঞ্চল, থাকবে না কেন? বাবা-মা সবই আছে। তবে বাড়িটা তো সেই কলকাতায়। এখানে তো আমি একা।

—আহা! তাই নাকি!

চঞ্চল বলে, তাই আজকের দিনটা আমার মনে থাকবে।

লক্ষ্মী চুপ করে কি ভাবছে। বলে সে, আমিও একাই। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাবাই আমাকে মানুষ করেছেন। বাবার কাছে নৃত্যই সাধনা। তার জন্য আমাকেও নাচ শিখতে হয়েছে। কিন্তু জানো—তবু কোথায় আমি একা। নিঃসঙ্গ। তাই আমার কাছে তোমার সঙ্গভরা এই দিনটার অনেক দাম।

বিকেল নামে ন্যাশন্যাল পার্কের বাগানে। রাজহাসের দল কলরব করছে। পাখীগুলো ফিরছে শাখার সন্ধানে, সাথীর সন্ধানে।

ওরা ফিরছে শহরের দিকে।

সমুদ্রের বুকে আঁধার নেমেছে। বড় একটা দোকানের সামনে

এসে গাড়ি থামায় চঞ্চল।

—চলো।

লক্ষ্মী চাইল, কি ব্যাপার!

—চলোই না!

লক্ষ্মীকেও নামতে হলো।

চোখধাঁধানো শাড়ির দোকান। চঞ্চল একটা দামী বেনারসী শাড়িই কিনে বসে। প্যাকেটটা তুলে দেয় লক্ষ্মীর হাতে। অবাক হয় লক্ষ্মী।

—কি হবে?

হাসে চঞ্চল, শাড়ি দিয়ে কি হয়? পরবে। এটা তোমাকে মানাবে চমৎকার। আর বাঙালীরা প্রিয়জনদের বেনারসী শাড়িতে দেখতে বেশী অভ্যস্ত। তোমাদের কাঞ্জিভরম শাড়ি খুব লাউড, উগ্র। দেখবে বেনারসী শাড়িতে স্নিগ্ধতা কত বাড়ে। লক্ষ্মীকে উগ্র দেখতে চাই না—স্নিগ্ধ রূপেই দেখতে চাই।

লক্ষ্মীর মুখে সলজ্জ আবেশ জাগে।

বাড়ির সামনে লক্ষ্মীরা নামল।

চঞ্চল বলে, আজ আর ওপরে উঠবো না। বড় টায়ার্ড লাগছে।

লক্ষ্মী বলে, কাল সন্ধ্যায় আসছো কিন্তু। কাল আমার চেম্বুরে অনুষ্ঠান, রাত্রি আটটায়। তুমিও সঙ্গে যাবে কিন্তু।

নরেন, বিমল, প্রকাশরা আজ প্ল্যান করেছিল ছুটির দিনটায় তারাও বের হবে চঞ্চলের গাড়িতে।

বোম্বাই থেকে দূরে কোথায় সমুদ্রের ধারে পিকনিক করবে।

প্রকাশ-এর মধ্যে দু'চারজন মহিলাদেরও চিনেছে। তাদের মধ্যেও দু'তিনজনকে বলেছিল।

নরেন প্ল্যান করে দিনভোর জিন উইথ লাইম। আর খাবার বাইরে থেকে তুলে নেব।

ছুটির দিন। ওরা নটা নাগাদ উঠেছে বাথরুম সেরে বাইরে এসে দেখে গৌর বাগানে মালির সঙ্গে বাগান পরিচর্যা করছে। নরেন শুধোয়, তোমার সাহেব কোথায়?

গৌর বলে, সাহেব তো সকালেই বের হয়ে গেছে।

—কখন ফিরবে? বিমল শুধোয় অধৈর্য হয়ে।

—তা তো কিছু বলে যান নি। তবে বাইরে লাঞ্চ করবেন তা বলে গেছেন।

—সে কি! নরেন বোস রীতিমত বিরক্ত হয়।

প্রকাশ বলে, তোদের জন্য সোসাইটিতে আমার প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার হয়ে গেল। কেন বললি যে যাবি আজ পিকনিকে।

নরেন বলে, কি করে জানবো যে চঞ্চলটা এমনি করে ডোবাবে।

বিমল কি ভাবছে। বলে সে, কোথায় যাচ্ছে ওটা বল তো। শালা চঞ্চল ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে না তো!

নরেনেরও কথাটা মনে হয়। বলে সে, হতে পারে। এতদিন একসঙ্গে ফুর্তিফার্তা করেছি, এখন ডানা-পালক গজিয়েছে তাই বোধহয় একাই উড়ছে দুসরা কোন চিড়িয়ার সঙ্গে!

বিমল বলে, তাই দেখতে হবে। গতিক সুবিধের বুঝছি না।

প্রকাশ গজগজ করে. বলিনি গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে!

নরেন জানায়. আমার নাম নরেন বোস, শ্যামবাজারের ছেলে আমি। এর জবাব কেমন করে দিতে হয় জানি। সদ্দারি করলে তাকে ছেড়ে দেব না।

গৌর শুনছে ওদের কথাগুলো। মনে মনে খুশীই হয়েছে সে। চঞ্চলদা ওই শয়তানদের হাত থেকে মুক্তি পাক এই সে মনে মনে চায়। আর সেইটাই ঘটতে চলেছে দেখে খুশী হয় সে।

সন্ধ্যার পর আজও প্রকাশ কোম্পানীর মন-মেজাজ ভালো নেই। স্টকে মালও সীমিত। ওদের তৃষ্ণা অপরিসীম, তাই রাগও জমে ওঠে।

চঞ্চলের ফিরতে রাত হয়। ক্লান্ত সে, সারা মনে খুশীর সুর। সামনে ওই অসুরের দলকে দেখে চাইল।

নরেন বলে,দিনভোর কোথায় ছিলি? কত জমিয়ে প্রোগ্রাম করলাম ছুটির দিন—সব ভেস্তে দিলি!

চঞ্চল পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে বলে, তোরা ঘুরে আয়। কদিন খুব ধকল চলেছে কারখানায়।

বিমল বলে, ওই কারখানা আর পয়সার হিসেব করেই মরবি তোরা!

নরেনরা বের হয়ে যায় তখনকার মত। জুহু বীচের ওদিকে কোন ঝোপড়পট্টিতে তারা এর মধ্যে মারাঠি দিশী মদ ঠাররার ঠেক বের

করেছে। খুব সস্তা আর বেশ তেজী মাল।

সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়িতে ওই ঝুপড়িগুলোয় মাছমারদের ভিড় জমে, তার মধ্যে ওই তিনমূর্তি ঝলসানো পমফ্রেট কাঁচা লঙ্কা সহযোগে ঠাররা গেলে।

চঞ্চলের কাছে পাঁচশো টাকা আমদানী, তিনজনের পঞ্চাশ-ষাট টাকায় নেশা হয়ে যায়। বাকী টাকাটা তাদের পকেটেই থাকে। মন্দ রোজগার নয় তাদের বসে বসে।

সুতরাং চঞ্চলকে ছাড়ার কোন কারণই থাকতে পারে না তাদের।

গৌর দেখে চঞ্চলের পরিবর্তনটা। বেশ এড়িয়ে চলছে এই তিন-মূর্তিকে। গৌরও এখন তাদের লাঞ্চ ডিনার মায় ব্রেকফাস্টের আইটেমও কমিয়ে দিয়েছে। সকালে ওদের দেওয়া হয় স্রেফ চাপাটি আর ভাজি, তার সঙ্গে চা। ডবল ডিম, ফ্রুট জুস, কলা-কমলালেবুর আইটেম বাদ। লাঞ্চও ডাল চাপাটি ভাত, কিছু সব্জী, চিকেন মাছ সপ্তাহে দু'একদিন।

কিন্তু গৌর দেখে তাতেই ওই তিনমূর্তি অনড়।

সেদিন তাই বলে গৌর চঞ্চলকে, রোজ রাতে ওদের ওই নেশার খরচা বাবদ টাকাটা কমাও। ব্যাটারা কোথায় ঠাররা গেলে ঝুপড়িতে বসে জানো? তিনজনের খরচা হয় বড় জোর পঞ্চাশ টাকা। বাকীটা ওদের পকেটে যায়।

চঞ্চল ভাবছে কথাটা। এবার তার মনে জেগেছে নতুন স্বপ্ন। লক্ষ্মীর পদধ্বনি শুনেছে সে জীবনে। তাই ওই অলক্ষ্মীদের হঠাতে চায় সে।

সেদিন গৌরকে নিয়ে গেছে সন্ধ্যার পর ওই জুহুর রামনাথনের ফ্ল্যাটে। আজ কি তিথি—ওরা মহাকালী মন্দিরে পুজো দিতে যাবে।

গৌর আজ লক্ষ্মীকে দেখে অবাক হয়। পুজারিনীর বেশেই দিনভোর উপবাস করে আছে। ফুল পুজোর জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠলো।

মহাকালী মন্দির একেবারে সমুদ্রের ধারেই।

চত্বরে আজ লোকজনের ভিড়। ওই ভিড়ের মধ্যে পুজো সেরে বের হয় লক্ষ্মী। চঞ্চল এগিয়ে যায়।

চঞ্চল ও গৌরকে প্রসাদ দেয় লক্ষ্মী।

আজ ওর পরনে সেই দিনের বেনারসী শাড়ি, ওকে যেন লক্ষ্মীর মতই দেখাচ্ছে ।

ওকে পেঁছে দিয়ে নিজেদের বাংলোয় ফিরছে ওরা ।

চঞ্চল শুধায়, গৌর, কেমন দেখলি লক্ষ্মীকে ?

চঞ্চল গৌরকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে । গৌরেরও ভালো লাগে শান্ত সুন্দর ভক্তিমতী মেয়েটিকে ।

বলে গৌর দারুণ গো ! একেবারে বাঙালী মেয়ের মত । বেশ শান্ত, ভদ্র । সত্যিই ভালো লাগলো ওকে ।

—কেন বলো তো ?

গৌর একটা কিছু যেন অনুমান করেছে । চঞ্চলও এবার মনে মনে কথাটা ভাবছে । ঘর বাঁধার কথা । লক্ষ্মীকে তারও ভালো লেগেছে, আর শান্ত মেয়েটির স্বভাবটাও মিষ্টি । ক্লান্ত চঞ্চল আজ ঘর বেঁধে শান্ত, থিতু হতে চায় । আর এতদিন পর তার মনের মত একজনের সন্ধান পেয়েছে ।

এমনিতেই চঞ্চল জেদি ।

বড়লোকের ছেলে, আর তার নিজেরও ব্যক্তিত্ব আছে । গুণও আছে, যোগ্যতাও । তাই নিজের ঘরনীকে সে বাবা-মায়ের পছন্দমত নয় নিজের পছন্দমতই বেছে নিতে চায় ।

আজ তেমন একজনকে পেয়েছে চঞ্চল ।

সারাদিন কারখানার কাজ নিয়ে থাকে । কাজেও যেন অনুপ্রেরণা পায় সে নতুন করে । প্রেম মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে । লক্ষ্মীর প্রেম চঞ্চলকে কি কর্মপ্রেরণা দিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে সেই আদিম উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন থেকে সে যেন এক নতুন আশার আলো-ময়.জীবনে এসে পড়েছে ।

বাবাকে কলকাতাতেও রিপোর্ট দেয় রোজকার কাজের, এবার যন্ত্রপাতি বসে গেছে । ট্রায়াল দিতে হবে ।

হরিনারয়ণবাবুও খুশী হন ।

—টার্গেট ডেটের আগেই এ কাজ শেষ করেছো, আশা করি ট্রায়ালও ঠিকমত হয়ে যাবে ।

মনোরমা খবর পায় গৌর মারফৎ ।

চঞ্চল এখন মন দিয়ে কাজ করছে, ওইসব রাতের জীবন ও ছেড়ে

এখন গুড বয় হয়েছে, আর সেটা হরিনারায়ণের কথাতেও জানতে পারে মনোরমা। স্বামী এখন ছেলের প্রত্যাশায় পঞ্চমুখ। বোম্বাইএ গিয়ে সে অসাধ্য সাধন করেছে।

গৌর এমনিতে বেশ চালাক চতুর

চঞ্চলের সঙ্গে ওই লক্ষ্মীর মেলামেশাটায় তারও সম্মতি আছে আর চঞ্চলও সাবধান করে গৌরকে. তুই তো মাকে প্রায় ফোন করিস।

গৌর আমতা আমতা করে, না, এমনি।

চঞ্চল বলে আর যা বলিস বলবি, ওই লক্ষ্মীর কথা একদম বলে ফেলিস না। তুই যা পেট আলগা মাল!

চঞ্চলের কথায় গৌর বলে, না, না। এত বোকা ভেবেছো আমাকে। তুমি গ্রীণ সিগন্যাল না দিলে মুখও খুলি না, হাতও চালাই না। না হলে দেখতে কবে তোমার বন্ধুদের কলকাতার টিকিট কাটিয়ে দিতাম!

চঞ্চল বলে, মনে রাখিস কথাটা।

লক্ষ্মীকে সেদিন চঞ্চল কথাটা জানায়। দুজনে এসেছে মার্ড আইল্যাণ্ডের সবুজ নির্জনে। বালুকণায় ঢেউগুলো ভেঙে পড়ে। সামনে মুক্ত সমুদ্র। গাংচিলগুলো ছোঁ দেয় ঢেউয়ের মাথায়। শান্ত পড়ন্ত রোদের ছায়া নামে।

চঞ্চল বলে, যদি ঘর বাঁধি আমরা লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী বালুচরে ভিজে বালি দিয়ে আপনমনে ঘর বাঁধছিল। নিপুণ হাতের মুঠো দিয়ে, ভিজে বালি দিয়ে প্রাসাদ গড়ছে। চঞ্চলের কথায় বলে, ঘর, এই তো গড়ছি।

চঞ্চল বলে, ওই ঘর নয়, দুজনের ছোট্ট একটি নীড়। সেখানে থাকবো তুমি আর আমি! পেশায় বিলিতী ডিগ্রীধারী ইনজিনিয়ার, বাপের একমাত্র ছেলে। নিজের রোজগারেও দুজনে বাঁচতে পারবো লক্ষ্মী। সেই বাঁচার জন্য আজ তোমাকে চাই। তুমি আসবে লক্ষ্মী আমার জীবনে?

চমকে ওঠে লক্ষ্মী।

—কি বলছো চঞ্চল? ভেবেচিন্তে বলছো?

চঞ্চল বলে, ঠিকই বলছি লক্ষ্মী। অনেক ভেবেছি. তোমাকে মন থেকে সরাতে পারিনি।

—কিন্তু ভিনদেশী আমরা।

—প্রেমের কোন সীমা নেই লক্ষ্মী, দেশকালের উর্ধ্বে প্রেম। লক্ষ্মী তবু ভীত কণ্ঠে বলে, তোমার বাবা-মা আছেন! মত নিতে হবে।

চঞ্চল বলে, আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, আমার পছন্দমত বিয়ে করলে তাদের অমত হবে না।

তবু লক্ষ্মীর ভয় যায় না। বলে সে, কিন্তু আমার বাবা আছেন।

চঞ্চল লক্ষ্মীর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলে. তার জন্য ভেবনা! আমি তোমার বাবার মত করাবো! শুধু তোমার মতই আজ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী দরকার।

লক্ষ্মীও যেন অজানতে ওই ছেলেটিকে ভালোবেসে ছিল। আজ তাই তারও অমত নেই। সেও ঘরের স্বপ্ন দেখে

জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। ঢেউয়ের চেহারা বদলে যায় শুধু আকৃতিই নয় প্রকৃতিও বদলে যায়। ওই কল্লোলমুখর সমুদ্রতীরে জীবনের বালুবেলায় দুজনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

হঠাৎ লক্ষ্মীর আর্তনাদে চাইল চঞ্চল।

লক্ষ্মী বালুচরে যে ঘরটা গড়েছিল সমুদ্রের একটা খেয়ালী ঢেউ এসে এক দমকা আঘাতে চুরমার করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লক্ষ্মী বলে, ওকি, দেখো ঘরটা কেমন ভেসে গেল

এ মা! হাসে চঞ্চল। বালুচরে ঘর বাঁধলে তা ভেঙেই যায় লক্ষ্মী! তাই মানুষ ঘর বাঁধে শক্ত জমিতে। বালুচরে নয়।

মার্ভ আইল্যান্ডের এই দিকে মচ্ছিমারদের একটা বসতি আছে। আগে এসব ওদেরই এলাকা ছিল। এখন বোম্বাইএর হালফিল ধনীদের দু'চারটে বাংলো গড়ে উঠেছে।

তবু এখনও বেশ কিছু জায়গায় সেই আদিম ঝুপড়ি-জাল-নৌকা আর নারকেল বনও রয়েছে। ফলে এখানে নারকেলের মুচি থেকে দেশী তাড়িও তৈরী হয়। আর দামেও সস্তা।

নরেন অ্যান্ড কোম্পানীর কাছেও এই খবরটা পেঁৗছে গেছে।

তাই সস্তায় এই খাটি নেশার দ্রব্য মেলার জন্য তারা এখানেও

আসে। দল বেঁধে মালডে থেকে অটো আসে খানিকটা। বাকীটা সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে এখানে চলে আসে, আজও এসেছে তারা।

আর এর মধ্যে বেশ কিছু ওই তাজা তাড়ি গিলে বালিয়াড়িতে বসে আছে, হঠাৎ নরেন চমকে ওঠে।

চোখে ওদের গোলাবী নেশার আমেজ, কিন্তু পাকা মাতাল তাই জ্ঞান টনটনে রয়েছে, শুধু চলাফেরায় একটা গড়বড় ভাব আছে মাত্র। বালিতে দুটো অবশ পা আরও অবশ হয়ে যায়। কিন্তু চোখ ঠিকই কাজ করে।

নরেন বলে, আরে চঞ্চল না? ওই যে সঙ্গে একটা চণ্ডু লাট! ওটাকে জোটালো কোত্থেকে? মনে হয় খুব জমেছে দুজনে। একেবারে আলুপোস্তর মত মাখামাখি কেস।

বিমলও দেখছে, সে দু পা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বালিতেই বসে পড়ে বলে, শালা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে বলিনি তোদের। এখন বন্ধুদের ফেলে রেখে একাই মজা লুটবে! নেভার!

প্রকাশ বলে, এসব টলারেট করবো না। সেলফিস জায়েণ্ট ব্যাটা। আজই এর হেস্তনেস্ত করবো। এখুনিই। কিন্তু উঠতে গিয়েই ধরণী-তলে লুটিয়ে পড়ে প্রকাশ মেহেরা। তিনজনেই তখন গড়াগড়ি দিচ্ছে বালিতে।

জ্ঞান ফেরে ওই তিনমূর্তির—হাঁটার সামর্থ্য ফিরে আসে ওই তিনমূর্তির। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আর দেখতে পায় না চঞ্চলদের কিন্তু ব্যাপারটা ভোলেনি তারা। নেশা ছুটে যাবার পর ব্যাপারটা আরও বেশী করেই ভাবছে তারা।

চঞ্চল রামনাথনকেই কথাটা বলে সেই সন্ধ্যায়।

রামনাথন তার মনিবকে চেনে। নিজেও বিরাট ইনিঞ্জিনিয়ার, তাছাড়া এতবড় প্রতিষ্ঠানের ভাবী মালিক। তার তুলনায় এই জয়লক্ষ্মী এক সামান্য ঘরের মেয়ে। টাকাপয়সার জোরও নেই। জয়লক্ষ্মীর বাবা এই অঞ্চলের পরিচিত ব্যক্তি এইমাত্র। তার কোন যোগ্যতা নেই যে এমনি ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

তাই রামনাথন বলে, ঠিক ভেবেচিন্তে বলছেন বস্। বিয়ে বলে কথা!

চঞ্চল বলে, হ্যাঁ রামনাথন! ওর বাবার যদি অমত না থাকে আমরা বিয়ে করবো! লক্ষ্মীরও মত আছে।

রামনাথন বলে, এ তো লক্ষ্মীর পরম সৌভাগ্য মিঃ চৌধুরী। লক্ষ্মীর বাবা একটু সাবেকি পন্থী মানুষ। হয়তো আপত্তি তুলতে পারে।

জয়লক্ষ্মীর বাবা মেদুরাপুরী চিদাম্বরম-এর কাছে কথাটা পাড়তে তিনি অবাক হন। এককালে তিনি স্বপ্ন দেখতেন নিজে বড় কলাকার হবেন, কিন্তু তা হননি। তবু এই নৃত্যের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মেয়েকেও নাচ শিখিয়েছেন। ভেবেছিলেন কলা জগতে তাঁর মেয়ের নাম পরিচিতি হবে। কিন্তু অর্থ নেই তাঁর. তাই পদে পদে বাধাই আসছে।

কিন্তু লক্ষ্মীর বিয়ের কথায় তবু অবাক হন তিনি, কি বলছো রামনাথন!

চঞ্চলও রয়েছে। রামনাথন বলে, ওর পরিচয় আমি জানি আংকেল, বিরাট বনেদী পরিবার। লক্ষ্মীর পরম সৌভাগ্য যে এমনি ঘরে ওর বিয়ে হতে চলেছে।

বলেন ওর বাবা, কিন্তু ওরা বাঙালী—আমরা অন্য প্রদেশের লোক। রীতিনীতি নিয়েও ফারাক আছে। তাছাড়া ওর বাবা-মায়ের মতামতের প্রশ্ন আছে।

চঞ্চল বলে, ওসব নিয়ে ভাববেন না। আমি বাড়ির একমাত্র সন্তান। বাবা-মায়ের কোন অমত হবে না। বিয়ে করেই জানাবো তাদের। আর আমার নিজেরও যোগ্যতা আছে, আমার স্ত্রীর কোন অমর্যাদা হবে না!

লক্ষ্মী আড়াল থেকে শুনছে কথাগুলো। আজ এ যেন তার জীবনমরণ সমস্যা। বাবার মতামতের ওপর তার সবকিছু নির্ভর করছে।

জয়লক্ষ্মীর বাবা বলেন, আমাকে একটা দিন ভাবতে দাও রামনাথন। মনস্থির করতে দাও।

রামনাথনও চায় এই বিয়েটা হোক। কারণ তারও প্রমোশনের

সুবিধা হবে : বস্, তার হাতেই থাকবে. গ্রামের জামাই হবে। তাই বলে রামনাথন, বেশ তো, ভাবুন আংকেল। কিন্তু লক্ষ্মীরও মত আছে এ বিয়েতে। ওরা সুখী হবে. আর আপনিও নিশ্চিন্ত হবেন।

বৃদ্ধ চাইল ওর দিকে। অসহায় কণ্ঠে বলেন তিনি, তুমি বলছো বাবা।

চঞ্চল বলে. আমি কথা দিচ্ছি লক্ষ্মীর কোন অমর্যাদা হবে না।

বৃদ্ধ বলেন, আমার একমাত্র সন্তান। গরীব হতে পারি কিন্তু ওর সম্মান আমার কাছে সবচেয়ে বড় বাবা!

চঞ্চল বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বৃদ্ধ বলে. তাহলে তোমরা যখন বলছো—মত দিলাম!

লক্ষ্মী আড়ালে খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। তার জীবনের এই সম্ভাবনাকে সে আজ সারা মন দিয়ে মেনে নিতে চায়।

খুশি মনে ফিরেছে চঞ্চল।

ওদিকে বাংলোয় ততক্ষণে তিন মূর্তি ফিরেছে। আজ নেশাটা তাদের মোটেই জমেনি, কেমন খিঁচড়ে গেছে মেজাজটা। ওরা দেখে তখনও ফেরেনি চঞ্চল।

প্রকাশ বলে, বর্লিনি ব্যাটা একাই মজা লুটছে। একেই বলে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।

নরেন গুম হয়ে বসে আছে। হঠাৎ চঞ্চলের গাড়িটাকে ঢুকতে দেখে ওরাও উঠে বসে।

নরেন বলে, এখন কিছু বলবি না। পরে কথা হবে ওপরে। ওই গৌরটা যেন শুনতে না পায়।

চঞ্চল আজ মনে মনে তৃপ্তির স্বপ্ন দেখে। রাতের বেলায় স্নান সেরে বসেছে। বন্ধুদের দেখে চাইল, আয়।

ওরা ঢুকেছে চঞ্চলের ঘরে। চঞ্চল এসময় ওদের সজ্ঞানে বাড়িতে বিরাজমান দেখে অবাক হয়। বলে. কি ব্যাপার!

নরেনই ওদের মুখপাত্র। সে বলে. এমনি করে ডেকে এনে পথে বসাবি তা তো ভাবিনি?

চঞ্চল বলে. কেন রে! কি হলো? কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত!

—বল্ অকাজ? বিমল গর্জে ওঠে।

চঞ্চল বলে, কি বলছিস তোরা !

নরেন এবার বলে ওঠে, ওই মেয়েটা কে ? মাড আইল্যাণ্ডে যাকে নিয়ে গেছলি ! মনে হয় অনেক দূরে এগিয়েছিস ।

চঞ্চল অবাক হয় । তাহলে দেখেছে ওরা লক্ষ্মীকে ।

প্রকাশ বলে, একাই মজা লুটবি ! আমরা পথে গড়াগড়ি খাবো তা তো হয় না ।

নরেন বলে, মেয়েটা মন্দ নয় তাহলে চল একদিন জমিয়ে ফুর্তি করা যাক !

বিমল বলে, মেয়েটা বেশ তাজা—মানে তরতাজা বলেই মনে হলো !

চঞ্চল এবার ওদের আর বাজে মন্তব্য করতে দিতে চায় না লক্ষ্মীর ব্যাপারে । ওদের রুচিতেও মিলছে না আর । অসহ্যই বোধ হয় ওদের । মেয়েদের ওরা ওই এক নজরেই দেখে । চঞ্চল বলে, ওর সম্বন্ধে আর মন্তব্য না করাই ভালো ।

—কেন ! কেন । সতীলক্ষ্মী না কি ছুঁড়িটা ! শালা বাজারের মাল—

চঞ্চল বলে, না । ওকে আমি চিনি, আর বিয়েও করছি ওই মেয়েটাকে । সব ঠিকঠাকও হয়ে গেছে ।

ওদের সামনে যেন বাজ পড়েছে চমকে ওঠে ওরা । বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে ক'জনে । যেন কথা বলার শক্তিও তাদের নেই ।

নরেন কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে, বিয়ে করছিস !

—হ্যাঁ ! কেন বিয়ে করতে নেই ?

নরেন এবার চুপ করে যায় । জানে সে চঞ্চল বিরাট বড়লোকের একমাত্র সন্তান । তাদের মত বেকার বাউণ্ডুলে পরগাছা নয় । নিজেরও যোগ্যতা আছে । তাই বলে নরেন, বিয়ে করবি বৈকি, নিশ্চয়ই করবি । এ তো খুব ভালো খবর । আমরাও খুব খুশী হয়েছি রে । এ তো গুড নিউজ, ভেরি গুড নিউজ !

বিমল চুপ করে থাকে ।

প্রকাশ গজগজ করে, বলিনি গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে একদিন । এখন তাই হয়েছে । বড়লোকের ছেলেগুলোই এমনি । সেলফিস জায়েণ্ট ! স্বার্থপর—খুদগর্জ ।

নরেন ওকে থামাবার চেষ্টা করে, থামতো, এতবড় সুখবরে আজ সেলিব্রেট করবো। চঞ্চলের সম্মতি হয়েছে। ভেরি গুড! মাল কই রে!

চঞ্চল বলে, তোরা মাল নিয়ে যা। ওঘরে বসে খাবি। আমি টায়ার্ড। আজ শুয়ে পড়তে হবে। কাল আবার অনেক কাজ! নে।

নরেন বিলিতী মদের বোতল হাতে পেয়ে সব দুঃখ ভুলে যায়।

পাশের ঘরে ওদের মহ্‌ফিল বসে।

প্রকাশ মনের জ্বালা ভোলবার জন্য মদ খাচ্ছে।

বিমল এদের মধ্যে কিছুটা হুঁশিয়ার, নরেন মাথামোটা গোঁয়ার গোছের। বিমল কথাটা ভেবেছে।

সে বলে, খুব তো মদ গিলছিস খুশীতে, এরপর কি হবে জানিস?

চাইল ওরা।

বিমল বলে, বিয়ে-থা করে ব্যাটা চঞ্চল এখানে ঘর পাতলে আর আমাদের পাত্তা দেবে? প্রেম করছে—ব্যস এতেই আর দলে ভেড়ে না। রাতে বাইরেও যায় না। বিয়ে করলে তখন দেখবি আউট করে দেবে বাংলো থেকে।

নরেনও এবার ভাবছে কথাটা।

বলে সে, তাই তো, ঠিক কথাই বলেছিস বিমল!

প্রকাশ বলে, বলিনি গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে। তখন বোম্বাইয়ে আর পায়ের তলায় মাটিই পাবি না। মুখ নীচু করে ল্যাজ গুটিয়ে কলকাতায় ফিরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে, এমন সুখকর পরিস্থিতি ঘটুক তাদের এরা তা চায় না। চঞ্চল তাদের কাছে কামধেনু। তাদের সেবার জন্যই চঞ্চলের আবির্ভাব। সুতরাং তাদের সেবার ত্রুটি ঘটাবে চঞ্চল এ হতে পারে না।

বিমল বলে, ব্যাটা লাভ ম্যারেজ করছে, গৌরের মুখে শুনলাম মেয়েটা নাকি নাচলেওয়ালী, দক্ষিণের মেয়ে।

প্রকাশ বলে, সেবাদাসী নয়তো!

বিমল বলে ওঠে, ওর বাবা-মাকে লিখে দিই তারা এসে পড়ে এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবে, চঞ্চল আমাদের হাতেই থাকবে।

নরেন বলে সব জেনে শুনে আর চঞ্চল আমাদের পুষবে? আউট

করে দেবে।

—তা সত্যি, প্রকাশ মন্তব্য করে।

বিমলও ভাবনায় পড়ে, তাহলে কি করা যায় ?

নরেনের পেটে মদ পড়লে মাথায় বদবুদ্ধিগুলো চাড়া দিয়ে ওঠে।

বলে সে, পথ একটা আছে, আর সেটা আমি ভেবেছি, মেয়েটা নাচনেওয়ালী না !

বিমল সায় দেয়, গৌর তাই বললো।

নরেন বলে, এখন বিয়ে হতে দে। আমরাও মহাউৎসাহে শালার বিয়ে দেব ! ওদের শুভেচ্ছা জানাবো। 'হনিমুন'এও পাঠাবো ওদের।

প্রকাশ বলে তারপর আমাদেরও তো টিকিট কাটাবে, ব্যাটা বৌ নিয়ে ঘরসংসার করবে আর আমরা অন দি রোড !

নরেন বিজ্ঞের মত বলে, আমি শ্যামবাজারের বোস বংশের ছেলে, বনেদী জমিদার ছিল আমার পূর্বপুরুষ, তোরা নিশ্চিন্ত থাক। এমন চাল দেব যে একেবারে কিস্তিমাত করে দেব, বেফিকির থাক তোরা। যা বলছি সেই মত কাজ করে যা মুখ বুজে।

বিমল তবু শুধায়, পরে প্রবলেম হবে না তো ?

—না-না।

নরেন বলে, এখন বিয়ের ব্যাপার। চঞ্চলও স্বপ্নের জগতে আছে। এই সময় বিয়ের আয়োজন খরচা বাবদও টু পাইস আমদানী হবে। ওটা করে নে। তারপর দেখবি নরেন বোসের খেল।

চঞ্চল জানে অন্যায় কাজ সে করছে না। লক্ষ্মীকে তার বাবা-মাও মেনে নেবে, কারণ গৌরও নিজে এ কাজে মদত দিচ্ছে।

ক'দিন ধরে এখন নরেনরাও চঞ্চলের এই বিয়ের ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করছে।

নরেন বলে, বিয়ে করছিস—উঃ কি খুশীই না হয়েছি। জীবনে থিতু হতে হয় রে ! তা বিয়ের ব্যাপারে যেন কোন ত্রুটি না হয়।

হোটেলে রিসেপশন, বিয়ের খরচা, শাড়ি-গহনা—এসবের মার্কেটিং, ফুলের ব্যবস্থা মায় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করছে নরেনরা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে।

নরেণ বলে, এই বোম্বাইওয়ালাদের দেখিয়ে দিতে হবে বাঙালি বিয়ে কি জিনিস !

চণ্ডলও লক্ষ্মীকে সম্মানের সঙ্গেই ঘরে আনতে চায়। তাই আয়োজনের কোন ত্রুটিই করে না।

নরেনই বলে, বিয়ের পর চলে যা হনিমুনে। আট-দশদিন উটকামণ্ডে কাটিয়ে আয়। দুজনের দুজনকে চেনা দরকার। তারজন্যই এই মধুচন্দ্রিমা। সিস্টেমটা খুবই ভালো।

চণ্ডলও ক'দিন ছুটি চায় একান্তে পেতে চায় লক্ষ্মীকে। তাই বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলে, যাতায়াত প্লেনের টিকিট, গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে বল। আর হোটেলও বুক করে দে।

নরেন টাকার বাণ্ডিলগুলো ব্যাগে পুরে বলে, নরেন বোসকে চিনিসনি এখনও। সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে থাকবে !

নরেনের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিমল প্রকাশের সাহায্যে আর গৌর-বরণের ম্যানেজারিতে বেশ ঘটা করেই নিখুঁতভাবে চণ্ডলের বিয়ে, বৌভাত, রিসেপশন এসব চুকে যায়।

চিদাম্বরমও খুশী হন। তাঁর একমাত্র মেয়ে সত্যিই যেন রাজার ঘরেই পড়েছে।

রামনাথনও বলে, বালিনি আংকেল তোমার লক্ষ্মী রাজরাণীর মত থাকবে।

বৃদ্ধ বলেন, সবই শিবশম্ভুদেবের দয়া! নটরাজের কৃপা। তোমরাও আশীর্বাদ কর লক্ষ্মী যেন সুখে থাকে।

লক্ষ্মী বিয়ের আগে অবশ্য এই বাংলোয় এসেছিল। জুহুর বাগানঘেরা বাংলো। বেশ বড়সড়ই। বেয়ারা-মালী-কুক সবই রয়েছে। আজ সে এই বাংলোয় এসেছে নতুন বউ হয়ে।

গৌর বলে, এবার দেখেশুনে নাও বৌদি।

নরেন প্রকাশদেরও চিনেছে লক্ষ্মী তার স্বামীর বাল্যবন্ধু এরা

নরেন বলে, গৌর, ঘরসংসারের ভার তো নিতেই হবে বৌঠানকে। আমরা আর ক'দিন ! তার আগে এদের হনিমুনটা সেরে আসতে দে।

চণ্ডলও খুশী হয়েছে। তার স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে এতদিন ধরে জীবনের একটা দিক যেন তার কাছে শূন্য হয়ে ছিল। আজ তার

সেই পূর্ণতার স্বাদ এসেছে জীবনে। পেয়েছে লক্ষ্মীকে।

তবু মনের কোণে একটা নীরব ব্যথার সুর জাগে নরেনের কথায়। বিকেলে বাগানে বসে চা খাচ্ছে তারা। নরেন বলে, চঞ্চল, আমরাও এবার ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়।

—কেন ?

বিমল, প্রকাশও রয়েছে। চঞ্চলের কথায় নরেন বলে, এবার ঘর-সংসার পাতলি, বৌঠানের প্রতি কর্তব্য আছে তো! ওর দিকে নজর দিতে হবে। তাই তোদের শান্তির সংসারে আর আমরা অশান্তি হয়ে থাকবো না।

বিমল বলে, থাকা সঙ্গত হবে না। তাই ভাবছি তোরা হনিমুন থেকে ফিরে আয়, জমিয়ে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে যাবো।

লক্ষ্মীও রয়েছে সেখানে। ক'দিন দেখেছে ওদের। চঞ্চলের জন্য ওরা অনেক খাটাখাটনিই করেছে। লক্ষ্মী বলে, চলে যাবেন কেন ?

হাসে নরেন, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না বৌঠান। আমরা তো বাইরের লোক। যোগাযোগ, বন্ধুত্ব এসব থাকলেই ভালো।

চঞ্চলও ভাবছে কথাটা। লক্ষ্মীকে সে একান্তেই পেতে চায়। আর ওই বন্ধুদের বিশ্বাস নেই, কোনদিন নেশার ঘোরে কি কাণ্ড ঘটাবে তা ওরাই জানে না। লক্ষ্মীর কাছে সে লজ্জায় পড়বে। তাছাড়া জীবনে যা পেয়েছে সে—তার কাছে ওই মাতাল লম্পট বন্ধুদের কোন দামই নেই।

তবু চঞ্চল বলে, থাক তো ক'দিন। উটি থেকে ফিরে আসি তারপর ভাবা যাবে।

নরেন বলে, ভাবার আর কিছুই নেই রে।

বিমল শোনায়, দূরে থাকাই ভালো। আমরা গীতাঞ্জলিতে টিকিটও পেয়ে গেছি। তোর ফিরে আসার ক'দিন পরই যাচ্ছি।

গৌর তবু নিশ্চিন্ত হয়। চঞ্চল আজ ঘর বেঁধেছে। আর ক'দিনেই গৌরও লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। বোম্বের তাবৎ মন্দিরে নিয়ে গেছে গৌর ওকে গাড়িতে। আর মাথা ঠুকে এসেছে লক্ষ্মী, গৌর প্রসাদ খেয়েছে। বলে সে, নাহ! মাসীমাও পুজো-আচচা খুব ভালো-

বাসে। তোমাকে এক নজরেই পছন্দ হয়ে যাবে! চঞ্চলদা এই একটা ভালো কাজ করেছে এতদিনে।

ফিরছে ওরা দুজনে। লক্ষ্মীর মনে জাগে তার নতুন শ্বশুরবাড়ির স্বপ্ন। সব মেয়ের মনের অতলে শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার মানুষদের সম্বন্ধে একটা কৌতূহল থাকে। লক্ষ্মী শুধায়, ওর বাবা-মা কেমন মানুষ গৌর?

গৌর বলে, মাসীমা যেন দেবী বৌদি। দয়ামায়ার শরীর। বিরাট বাড়িতে কতজনকে আশ্রয় দিয়েছেন, কত অন্নবস্ত্র দেন তার হিসাব নেই। এই আমি—আমি ব্যাটা তো এইটুকু থেকে ওখানেই মানুষ। মাসীমা না হলে আমিই ফৌত হয়ে যেতাম।—আর চঞ্চলদার বাবা—! সংসার সম্বন্ধে ওঁর কোন মতামতই নেই। ব্যবসাই বোঝেন, তাই নিয়েই থাকেন। বিরাট বাগানঘেরা বাড়ি, লোকজন—সে এক এলাহি ব্যাপার। যাবে তো, গিয়েই দেখবে সেখানে।

লক্ষ্মী স্বপ্ন দেখছে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা অমনি প্রাসাদের স্বপ্ন।

বিকেলে ফ্ল্যাইট ছাড়বে—বোম্বাই টু ব্যাঙ্গালোর। সেখানের কোন হোটেলে রাত কাটিয়ে ওরা পরদিন সকালে মহীশূরে। সেখানে কাবেরী নদীর ধারে লক্ষ্মীবিলাস প্যালেস হোটেলে রাত কাটাবে। সামনে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে বৃন্দাবন গার্ডেনস্। ফোয়ারার জল উঠছে, নানা রংয়ের বাহার ফুটে ওঠে ওই জলধারায়।

লক্ষ্মী আর চঞ্চল এসেছে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এইখানেই। এখানে রাত্রিটা থেকে ওরা চলে যাবে উটিতে। এখান থেকে প্রায় একশো চল্লিশ মাইল পথ।

লক্ষ্মী আজ ওই ফোয়ারার রংবাহারে আর মনের খুশীর জোয়ারে যেন স্বপ্ন দেখে।

চঞ্চলও এতদিন পর দুজনে দুজনকে কেন্দ্র করে বাঁচার পথ পায়।

লক্ষ্মী বলে, তোমার বাবা মাকে জানালে না?

চঞ্চল ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে এত ভাবছো কেন।

লক্ষ্মী ওর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে বলে, না গো, কেমন ভয় করছে

আমার।

—কেন?

ভীতকণ্ঠে বলে লক্ষ্মী, এত সুখ কি আমার কপালে সইবে?

হাসে চঞ্চল, পাগল!

ক'দিন যেন ঝড়ের মত কেটে যায়। মহীশূর থেকে চলেছে ওরা শৈল শহর উটকামণ্ডের দিকে।

কিছুদূর এসে শুরু হয় চন্দন বন। পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো চন্দনের গাছ। সেই চন্দন বনের পর শুরু হয় আদিম অরণ্য আর পর্বতসীমা। বন্দীপুর—মধুমাল্লাই গেম স্যাংচুয়ারি পার হয়ে এবার পাহাড়ের বুক ঠেলে উঠছে তারা দুদিকে সবুজ চা বাগান ছেড়ে। উজ্জ্বল সবুজ হলুদ পাতার সমারোহ, মেঘগুলো এখানে পাহাড়ে এসে ঠেকে।

লক্ষ্মী ওই মেঘের শোভা দেখে বলে, চা বাগানের নাম কি জানো? দ্যাখো—বোলভার ক্লাউড টি এস্টেট! সাদা মেঘেরই রাজ্য এখানে।

উটিতে লেকের ধারে ছায়াঘন পাইনবনের মাঝে একটা সুন্দর হোটেলে ওঠে তারা। এ যেন স্বপ্নরাজ্যই।

লক্ষ্মী এখানে চঞ্চলকে নিবিড় করে পায়। চঞ্চলও কদিনের জন্য যেন ভুলে গেছে তার পিছনের সব পরিচয়। এই নিভৃত নির্জনে তার জীবনপ্রবাহ আবর্তিত হয় সম্পূর্ণ একজনকেই কেন্দ্র করে।

সেই ওই জয়লক্ষ্মী! লক্ষ্মীও সব ভুলে আজ চঞ্চলকে নিয়েই বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু বাস্তব জীবনে স্বপ্নের কোন ঠাঁই নেই। তাই আট-দশদিন পার হয়ে যায় কোন দিক দিয়ে তা বুঝতেই পারে না তারা। আসে ফেরার দিন।

লক্ষ্মী বলে, ক'টা দিন কোন দিকে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

চঞ্চল বলে, সুখের দিন কোন দিকে কেটে যায় তাড়াতাড়ি, শুধু কাটে না দুঃখের দিনগুলোই। বড় ভারি ঠেকে।

লক্ষ্মী বলে, দুঃখের স্বপ্ন দেখে আর কাজ নেই বাবা।

সাণ্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে এসে হাজির হয়েছে বিশ্বস্ত বুলডগের মত ওই তিনমূর্তি। নরেন অবশ্য এই কদিন সদলবলে তোফা আরামেই ছিল বাংলায়।

চঞ্চলের বিয়ে উপলক্ষে খরচখরচা থেকে বেশ কয়েক হাজার নরেন নিজেই সরিয়েছে। তাছাড়া পার্টির জন্য যা মদ আনিয়েছিল সব তা কাজে লাগায়নি।

ফলে এই ক'দিন তোফা আরামেই ছিল তারা।

নরেন বলে, চালা পান্সী। ব্যাটা চঞ্চল মজা লুটছে উটির পাহাড়ে। আমরা বোম্বাই ই পান্সী চালাই।

বিমল বলে, আর ক'দিন। ফিরে এসে কপোতকপোতী দুজনে ঘর বাঁধবে আর আমরা আউট।

প্রকাশ বলে, এরপর কি করে চলবে তাই ভাবছি।

নরেন শোনায়, এত মুষড়ে পড়ছিস কেন? হিংসে হচ্ছে নাকি চঞ্চলকে?

প্রকাশ বলে, হবে না? কারও পোষমাস, কারও বা সর্বনাশ।

নরেন এবার তৈরী হয়েছে।

এখন থেকেই তাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে চরম আঘাত হানার জন্য। তাই বলে প্রকাশকে, বিপদের সময় ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হয়। দেখবি পথ একটা বের হবেই।

প্রকাশ বলে, ও তো প্রথম থেকেই শুনছি তোর মুখে। করতে পেরেছিস কিছু। ওরা ফিরছে, তারপর তিনদিনের মাথায় ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান, ফেরো সেই হতচ্ছাড়া কলকাতায়।

নরেন বলে, এবার একটা কাজ করতে হবে। প্রকাশ তোর তো কিছু খাসা মাল এখানে চেনাজানা আছে। আগেও তো সাপ্লাই, চামচাগিরির কাজ করতিস এখানে।

প্রকাশ বলে, তা অবশ্য করেছি, রইস আদমী কিছু চেনা-জানা আছে। মালদার পার্টি তারা, রসিক লোক।

নরেন বলে, তাহলে যা বলি শোন।

বিমলও হুঁশিয়ার হয়ে শোনে, মনে হয় নরেনের বুদ্ধিটা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে আর চঞ্চলও সেদিন তাদের আরও কাছে এসে পড়বে, একেবারে তাদের

হাতের মধ্যে।

এদের পায়ের তলায় হারানো মাটি আবার ফিরে পাবে নরেন অ্যাণ্ড কোম্পানী।

প্রকাশ তারিফ করে, ভেরি গুড আইডিয়া। জিতা রহো নরেন।

নরেন বলে, বোসবংশের বংশধর আমি, আমার চাল ঈষৎ মোক্ষমই হয় বৎস! ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে কিস্তিমাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু খুব সাবধান, এসব যেন কোনদিন কাকপক্ষীও না জানতে পারে।

বিমল বলে, এ নিয়ে ভাবিস না।

প্রকাশ জানায়, আমার খেলও দ্যাখ এবার।

মালা ফুলের তোড়া নিয়ে তিনমূর্তি অপেক্ষা করছে এয়ারপোর্ট-এর লাউঞ্জে। ব্যাঙ্গালোরের ফ্লাইট ল্যাণ্ড করেছে। দূর থেকে দেখা যায় টারম্যাক দিয়ে হেঁটে আসছে চঞ্চল, লক্ষ্মী।

—বৌঠান! ওয়েলকাম হোম।

—চঞ্চল!

পাগলের মত হাত নাড়ে এরা, এগিয়ে আসতে ছুটে গিয়ে লক্ষ্মীর হাতে ফুলের গুচ্ছ দিয়ে অভ্যর্থনা করে।

নরেন শুধোয়, কেমন কাটল হনিমুন! অবশ্য বৌদি যেন ফুল-মুনের মত উদয় হয়েছে।

লক্ষ্মী সমুজ্জ্বলভাবে বলে, ভালোই কাটলো।

—কোন অসুবিধে হয়নি তো? বিমল শুধোয়।

চঞ্চল বলে, না নরেন। তোর প্রোগ্রামিং সব ঠিক ছিল, মায় হোটেল অবধি। সুন্দর হোটেল।

লক্ষ্মীদের নিয়ে ফিরছে ওরা বাংলোয়।

চঞ্চল বলে, বাংলোয় পৌঁছে একবার ফ্যাক্টরী ঘুরে আসি। বাবা জানেন আমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছি।

ফিরে এলাম সেটা জানাতে হবে। আর কাজও কতদূর এগোলো দেখে আসি।

নরেন বলে তুই কিরে, ঘরে নতুন বউ।

চঞ্চল বলে, কাজও করতে হবে তো! দেরি হবে না লক্ষ্মী। বিকেলেই ফিরবো। তুমি লাঞ্চ করে নিও, তোরাও লাঞ্চ করে নিস নরেন।

নরেনের এখন শেষ কাজ বাকী।

সন্ধ্যার পর ফিরেছে চঞ্চল, বাংলোর বাগানে এখন আর মদের আসর নয়। চায়ের আসরই বসেছে।

ছটফট করছে নরেন কোম্পানী। এই পরিবেশে তারাই হাঁপিয়ে উঠেছে। মদ নেই হৈচৈ নেই। চঞ্চলের পকেট কেটে আমদানী, ফূর্তিও বন্ধ হয়ে গেছে ওই মেয়েটি আসার জন্য।

ওই লক্ষ্মীই যেন তাদের অলক্ষ্মী। নরেন বলে, চঞ্চল পরশু সন্ধ্যার ক্যালকাটা মেলেই ফিরবো ভাবছি।

চঞ্চল চাইল। আজ সে ওদের বাধাও দেয় না।

বিমল, প্রকাশও দেখছে সেটা। চঞ্চল শুধোয়, টিকিট ?

বিমল বলে, হয়ে গেছে।

নরেন বলে, চলেই যাচ্ছি। এতদিন তোর এখানে থাকলাম। হাজার হোক ছেলেবেলার বন্ধু। যাবার আগে কালই সন্ধ্যায় তোদের দুজনকে একটা পার্টি দিতে চাই।

চঞ্চল বলে, এসব কেন রে!

হাসে প্রকাশ, তুই বাধা দিস না চঞ্চল।

নরেন জানায়, হোটেল ব্লুস্টার-এ পার্টি দিচ্ছি। জাস্ট এ গেট টুগেদার। তোর কারখানার রামনাথন, আরও দু'একজন বন্ধুকে বলেছি। গোরও থাকবে, সন্ধ্যায় ওখানে একটু গানটান খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। বৌঠানের ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানও থাকবে! কি বৌঠান রাজী তো?

লক্ষ্মী সলজ্জভাবে চাইল চঞ্চলের দিকে যেন অনুমতিই চাইছে সে। চঞ্চল আজ বন্ধুদের দুঃখ দিতে চায় না। বলে সে, ওরা যখন ধরেছে, হবে ওর অনুষ্ঠান।

নরেন বলে, হোটেলের কনফারেন্স হলটা বুক করেছি, একটা রুমও নিয়েছি। বৌঠানের ড্রেস চেঞ্জ করতে লাগবে।

চঞ্চল বলে হাসতে হাসতে, আমার চাঁদাটাও কিন্তু নিতে হবে তোদের। সে একটা বাণ্ডিল এগিয়ে দেয়। নরেন অবশ্য ধন্যবাদ দিয়েই চাঁদাটা নেয়।

ব্লুস্টার হোটেল এমন কিছু নামী দামী হোটেল নয়। তবু

আয়োজন ভালোই করেছে নরেন বোস এণ্ড কোম্পানী। চঞ্চল অফিস থেকে আসবে। লক্ষ্মী তার আগেই হোটেলের ঘরে চলে যাবে।

নরেন প্রকাশ বিমলরাও থাকবে, পার্টির সব আয়োজন করতে হবে, সাজাতে হবে হলটা। গৌরও রয়ে গেছে এদের সঙ্গে।

সন্ধ্যার মুখে কারখানা থেকে এসেছে চঞ্চল হোটেলে। নরেন, প্রকাশ, বিমল, গৌর তখন ওখানে ব্যস্ত। রামনাথনও এসেছে, এসেছে রামনাথনের কিছু বন্ধু, লক্ষ্মীর বাবা চিদাম্বরমকে আমন্ত্রণ করেছে এরা।

ছোট্ট অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চও তৈরী।

অতিথিরাও এসে গেছেন। আসছেন বাকীরা!

চঞ্চল শুধোয়, লক্ষ্মী আসেনি? দেরি করছে বোধ হয়।

নরেন বলে, ছটফট করছিস কেন! বোস তো, বৌঠান এসে গেছে আগেই।

প্রকাশ বলে, দুশো তিন নাম্বার রুমেই আছে। ওখানেই ড্রেস করছে বোধ হয়, এসে পড়বে।

ওরা দেখছে চঞ্চলকে, চঞ্চল কি ভেবে নিজেই এগিয়ে যায়। বলে সে, তাড়া না দিলে তৈরী হবে না, আমি দেখছি, অনুষ্ঠানের দেরি করা ঠিক হবে না।

বের হয়ে যায় চঞ্চল ওই ঘরের দিকে।

লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে একাই রয়েছে, এবার শাড়ি বদলে সে নাচের অনুষ্ঠানের জন্য পোশাক বদলাতে যাবে।

হঠাৎ দরজা ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়। নির্জন ঘর। মোটা মত একটা লোক ঢুকছে, সে দেখছে ওই শায়া ব্লাউজ পরা নিটোল যৌবনবতী মেয়েটিকে। চোখে ওর তৃপ্তির হাসি।

—নাহ্ ভেরি গুড, নাও অ্যাডভান্সই পেমেণ্ট করি আমি।

একটা পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলই ছুঁড়ে দেয় সামনের টেবিলে, এগিয়ে আসছে মোটা শেঠজী, লোভী, হিংস্র ভালুকের মত থপ্‌থপ্ করে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্মী ব্যাপার দেখে বলে, কে! কে আপনি? এখানে কেন এসেছেন?

হাসছে শেঠজী, কেনে এসেছি মালুম নাই। অ্যাঁ—দালাল এসে বাতচিত করলো। দালালী ভি দিলাম তাকে, তোমার রুপেয়াভি

দিলাম আভি বলো—কেনে এসেছি। কি যে বলো মাইরী। রসিকতা করছো কাহে মেরি জান!

লোকটা এসে লক্ষ্মীকে যেন হিংস্র বাঘের মত জড়িয়ে ধরতে চায়। লক্ষ্মীও প্রমাদ গোনে।

—যান! বের হয়ে যান!

লোকটাও ধরতে যায় ওকে, ওর হাতের মুঠোয় লক্ষ্মীর ব্লাউজটা একটা কঠিন ঝটকায় সে যেন নগ্ন করে দিতে চায় লক্ষ্মীকে।

প্রাণপণে লক্ষ্মী তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। খুলে গেছে বেণী, তার পোশাক ছিঁড়ে গেছে হাঁপাচ্ছে জানোয়ারটা কি এক উত্তেজনায়।

হঠাৎ এমনি সময় দরজা খুলে ঢুকেছে চঞ্চল।

সেও থমকে দাঁড়ায় লক্ষ্মীকে ওই অর্ধনগ্ন অবস্থায় একটা অচেনা লোকের সঙ্গে ওই ভাবে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে লক্ষ্মী।

লোকটাও পাকা শয়তান, ও জানে কখন আক্রমণ করতে হয়। আর কখন এসব ক্ষেত্রে নিপুণভাবে পিছু হটতে হয়। না হলে গোলমাল হবে।

তাই চঞ্চলকে ঢুকতে দেখে লোকটা খোলা দরজা দিয়ে চকিতের মধ্যে বের হয়ে যায়।

চঞ্চল স্তব্ধ, নির্বাক, বিস্মিত, ঘৃণাভরা চাহনিতে দেখছে লক্ষ্মীকে, দেখছে টেবিলে পড়ে আছে টাকার বাণ্ডিলটা, আজ সে জেনেছে লক্ষ্মীর প্রকৃত পরিচয়। সে জাত দেবদাসীই। আজও তার রক্তে সেই স্বৈরাচার, কোন বহুভোগ্যা নারীর সত্তাই বিরাজ করে, টাকার বিনিময়ে ওরা দেহ বিক্রী করে। দেহপসারিণীই।

আর চঞ্চল কি মোহের বশে অমনি এক দেহপসারিণীকে তার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে এনেছিল!

আজ চঞ্চলের সেই মোহ ভঙ্গ হয়েছে।

এগিয়ে যায় সে। লক্ষ্মী কি অসহায় অপমানে কান্নায় ভেঙে পড়ে! চঞ্চল বলে, লোকটা কে?

লক্ষ্মী মাথা নাড়ে। সে চেনে না তাকে। এর আগে কোন দিন দেখেওনি। বলে সে, চিনি না!

গর্জে ওঠে চঞ্চল, মিথ্যা কথা ! চেন ওকে !

চাইল লক্ষ্মী, না ! বিশ্বাস কর ।

—থামো ! আর তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না ! লক্ষ্মী অবাক হয়, কি বলছো তুমি !

টাকার বাণ্ডিলটা দেখিয়ে বলে, টাকা নিয়ে দেহ বিক্রী করা তোমার পেশা। আর ওরাই তোমার ওই দেহটাকে টাকার দামে কেনে। তাই যদি তোমার পরিচয় তবে কেন—কেন ঠকালে আমায় —কেন ?

লক্ষ্মীর দুচোখে বিস্ময়, আতঙ্কের ছায়া ।

—এ কি বলছো তুমি ! না—এসব মিথ্যে। ওই লোকটা এসে আমাকে অপমান করতে গেছল !

চঞ্চল বলে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিতে যেও না। তুমি কি, কি তোমার পরিচয় তা বুঝেছি। ছিঃ ছিঃ, আমি এমনিভাবে ঠকে গেলাম ! এতবড় ভুল করলাম ! কেন ? কেন এভাবে ঠকালে আমায় ?

লক্ষ্মীর দুচোখে জল নামে ।

এসে পড়েছে নরেন, প্রকাশ, বিমলরাও। ওরাও দেখছে ব্যাপারটা। এসে পড়ে গৌরও ।

সেই-ই বলে, এসব কি বলছ চঞ্চলদা বৌদিকে !

চঞ্চল বলে, যা নিজের চোখে দেখেছি তা মিথ্যে নয় ।

নরেন এগিয়ে আসে, কি বলছিস এসব !

লক্ষ্মীর বাবা চিদাম্বরমও এসে পড়ে ।

চঞ্চল গর্জে ওঠে, এসব সত্যি নরেন। নিজের চোখে দেখলাম টাকা নিয়ে ও দেহ বিক্রী করে। ও দেহপসারিণী, বেশ্যা, নষ্টা !

কান্নায় ভেঙে পড়ে অসহায় লক্ষ্মী। বলে সে, না, এসব মিথ্যে যা দেখেছ—যা ভাবছো তা ভুলই, লোকটাকে আমি চিনি না ।

—থামো ! এত নীচ তুমি ! দেহপসারিণী—নাচওয়ালি !

এগিয়ে আসে চিদাম্বরম। বলে সে, এসব কি বলছো তুমি ? কাকে বলছ জানো ? আমার মেয়ের সম্মান রেখে কথা বলবে ? আজ সে তোমারও স্ত্রী ।

চঞ্চলের মাথায় যেন রক্ত উঠে গেছে। বলে সে, এই পরিচয় জানার পর আর তাকে আমার স্ত্রীর পরিচয় দিতে আমি রাজী নই ।

সে আমার কেউ নয় !

গৌর এগিয়ে আসে, চঞ্চলদা !

নরেন বলে, এসব কথা বলতে নেই চঞ্চল। যা দেখেছিস—

চঞ্চল বলে, যা দেখেছি তাই যথেষ্ট। এই নষ্টা মেয়েটাকে আর স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে আমার বংশের নাম ডোবাতে রাজী নই। ও আমার কেউ নয়—কেউ নয়—

লক্ষ্মী আর্ত কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস কর, তুমি আমার স্বামী। তোমার নামে শপথ করে বলছি।

চঞ্চল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, তোমাদের স্বামী তো টাকা দিলেই সাজো যায়। তেমন স্বামী সাজার ইচ্ছে-আমার কণামাত্র নেই।

চিদাম্বরম চাপা রাগে ফুলছে।

লক্ষ্মী আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে।

চঞ্চল কঠিন কণ্ঠে জানায়, টাকা যা লাগে নিয়ে সরে যাও আমার জীবন থেকে। আর এই বাড়িতে তোমার ঠাঁই নেই। আমিও জানবো একটা ভুলই করেছিলাম। সেই ভুলকে ভুলে যেতে চাই।

লক্ষ্মী চমকে ওঠে, কি বলছ তুমি! আমার কি দোষ! কেন—কেন বিনাদোষে এতবড় শাস্তি দেবে আমায়!

নরেন বলে, চঞ্চল!

গৌর বাধা দেয়, এত বড় ভুল অবিচার তুমি করো না দাদা!

চঞ্চল বলে, যা দেখেছি নিজের চোখে তাতে সব মোহ আমার কেটে গেছে। নিজের পথেই যাও তুমি। মুক্তিপণ বাবদ কত টাকা দিতে হবে বলো? লোক ঠকানোই তোমার পেশা—বল কত দাম দিতে হবে।

লক্ষ্মী। কান্নায় ভেঙে পড়ে এই অপমানে, লজ্জায়।

এবার চিদাম্বরম বলে, লক্ষ্মী! এরপর আর এখানে থাকা যাবে না। তুই ফিরে চল মা। গ্রামের সেই পরিবেশেই নতুন করে মান-সম্মান নিয়ে বাঁচবো। আর চঞ্চল, শুনেছি মস্ত বড়লোক তোমরা। টাকা দিয়েই সব কিছু কিনতে চাও। কিন্তু জানো না যে, এমন কিছু জিনিস আছে পৃথিবীতে টাকায় তার মূল্য হয় না। তা সম্মান। তাই লক্ষ্মী ফিরেই যাবে, তোমার মত অমানুষের ঘরে সে যাবে না।

—বাবা! লক্ষ্মী আর্তনাদ করে ওঠে।

চিদাম্বরম বলে, হ্যাঁ মা। আজ এতবড় অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ তোকে করতেই হবে। আমি জানি—তুই ফুলের মত পবিত্র; তাই বলছি মা—ঈশ্বর একদিন এর বিচার করবেন। চলে আয় মা!

চঞ্চল বলে, তাই যান।

চিদাম্বরম বলে, তাই যাচ্ছি; আর মুক্তিপণ! তোমার অর্থ স্পর্শ করতে চাই না। আমার একমাত্র মেয়েকে আমিই ভরনপোষণ করতে পারবো। তার জন্য তোমার কপর্দকও আমার প্রয়োজন হবে না। আয় মা!

বের হয়ে যায় চিদাম্বরম।

কান্নায় ভেঙে পড়ে লক্ষ্মী।

চঞ্চল স্তব্ধ কঠিন দৃষ্টি মেলে দেখছে ওদের।

গৌর বলে, এ কি করলে চঞ্চলদা!

চঞ্চল বলে, ঠিকই করেছি। আমি ভুল করিনি!

এক নিমেষের মধ্যেই এতবড় ব্যাপারটা ঘটে গেল।

আজ চঞ্চলের জীবনে অকস্মাৎ একটা শূন্যতা এসে গেছে। রাত্রে ফিরেছে ওরা বাংলোয়। যেন প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরেছে।

গৌর চুপ করেই থাকে।

উপরের ঘরে চঞ্চল সেই ঢুকেছে আর বের হয়নি।

এদিকের ঘরে আজ রাতে প্রকাশ, নরেন, বিমলের দল বোতল খুলেছে। আজ তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

নরেন বলে, এখন চুপচাপ থাকবি। দেখলি তো কেমন এক চালে বাজিমাৎ করে দিলাম।

প্রকাশ বলে, তা সত্যি! এখন বড় ভেঙে পড়েছে চঞ্চল।

বিমল বলে, একটু সামলাতে দে বেচারাকে। তারপর দেখবি আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

চঞ্চলের মনে হয় যেন তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। সবকিছু শূন্য হয়ে গেছে। মনমেজাজও ভালো নেই চঞ্চলের। রাতে ঘুমুতে পারে না চঞ্চল। কোথায় কি হয়ে গেল। তার

ভালোবাসার এমনি একটা নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটবে তা ভাবতেও পারেনি। বোম্বাই যেন বিষিয়ে গেছে তার কাছে।

পরদিন সকালে উঠেছে চঞ্চল। দেখে নরেন, প্রকাশ, বিমলদের। ওরাই এগিয়ে আসে।

চঞ্চল বলে, তোরা আজ যাচ্ছিস তো?

নরেন চাইল।

বিমল, প্রকাশও চুপ করে থাকে।

নরেন বলে, এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তোকে একা ফেলে রেখে যাবো!

চঞ্চলের কাছে আজ সব যেন বদলে গেছে। একাই থাকতে চায় সে। বলে চঞ্চল, তাতে কি হয়েছে,তোদের আর আটকে রাখবো না।

গৌর এসে পড়ে। তার মনে হয় এরপর এই আপদদের এখানে না থাকাই ভালো। থাকলে চঞ্চলেরই বিপদ। গৌর বলে, তাই ভালো নরেনদা। আপনাদের তো আজই যাবার টিকিট। গাড়ি আমি নিয়ে আসবো স্টেশনে পেঁছে দেব। সব গোছগাছ করে নেন।

অর্থাৎ এবার নরেনদের জোর করেই এরা তাড়াবে।

চঞ্চল কি ভেবে বলে, গৌর, ওদের শ'পাঁচেক টাকা দিবি তো। ট্রেনে খরচা আছে।

কথাটা বলে উঠে গেল চঞ্চল। তার যেন সব হিসাব, জীবনের ছন্দ বেতালা হয়ে গেছে। আর এখানে ভালো লাগছে না।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কলকাতাতেই ফিরবে। বোম্বে এসে অনেক কিছুই পেয়েছে মনে হয়েছিল তার। আজ মনে হয় ঠকেই গেছে নিদারুণভাবে।

ঠকিয়েছে তাকে ওই একটি মেয়ে লক্ষ্মী। যাকে সে তার জীবন থেকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মনের ক্ষতটা মিলোয় না। একটা গভীর ক্ষতের মতই রয়ে গেছে। মিথ্যা হয়ে গেছে সব ধারণাই।

নরেন, প্রকাশ, বিমলের দল এবার বিপদে পড়ে। চলেই যেতে হয় তাদের। চঞ্চলও যেন বদলে গেছে একেবারে।

বলে প্রকাশ, কি বুদ্ধি করলি, আমরা তো গেলাম, চঞ্চলের বৌটাও গেল! কাজের কাজ কিছুই হল না।

নরেনও এটা আশা করেনি। মনে মনে সে চটে উঠেছে চণ্ডলের ওপর। তাই প্রকাশের কথায় বলে, বেশ হয়েছে শালা বড়লোকের বাচ্চার। শালা বেইমান, বন্ধুদের তাড়িয়ে নিজে ঘর করবে! দিলাম শালার ঘর করার বারোটা বাজিয়ে।

বিমল বলে, তবু চলছিল ওর ঘাড়ে, এখন কি হবে?

প্রকাশ শোনায় তার সেই এক ডায়ালগ, গাছে তুলে মই কেড়ে নিল, বেইমান কোথাকার। চল কলকাতায় গিয়ে আবার সাপ্লাই-এর কারবারই করতে হবে। এসব তো চৌপট হয়ে গেল।

বের হয়ে পড়ে ওরা। বোম্বাইয়ের খেল এখন খতম হয়ে গেল ওদের। ফিরছে তিনমূর্তি। তিনজনেরই এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

বিমল বলে, নরেন, বেশ তো কামালি বিয়ের নাম করে। কিছু মালকড়ি দে। একাই খাবি!

নরেন বলে, একদম চুপ করে থাকবি। তোদের তো ভাগ দিয়েছি।

বিমল বলে, সে তো ছিঁটেফোঁটা। তাড়া তাড়া নোট গেল কোথায়?

প্রকাশ বলে, বেইমানী করবি না একদম!

নরেন আজ দেখছে ওরা তো তাকে ছাড়বে না। এ যেন বিপদেই পড়েছে সে! নরেন তাই বলে কলকাতায় চল। তারপর বসে হিসেব দেব। যদি পাস নিশ্চয় দেব।

বিমল বলে, সব দিতে হবে। না হলে তোর ওই প্ল্যান করে প্রকাশকে দিয়ে লক্ষ্মীর হোটেলের ঘরে লোক ঢুকিয়ে নোংরা কারবার করার কথাও বলে দেব চণ্ডলকে।

নরেন গর্জে ওঠে, একা আমি করেছি? তোরা মদত দিসনি? ভয় দেখাচ্ছিস আমাকে?

তিনজনের মধ্যেই এবার ওই নাটক শুরু হয়ে যায়।

প্রকাশ বলে, এখন ট্রেনে ওসব কথা থাক। কলকাতায় গিয়েই মীমাংসা হবে।

অর্থাৎ কেমন ধরনের মীমাংসা করবে ওই বিমল আর প্রকাশ। তাও কিছুটা বুঝতে পেরেছে নরেন। তাই এবার কলকাতা পৌঁছে সেও সাবধান হবে ওদের সম্বন্ধে। কারণ নরেন যে বেশকিছু পয়সা ম্যানেজারি করে মেরেছে তা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু আর

মৌকা পাবে না, চঞ্চল একেবারে বিগড়ে গেছে তা বুঝেছে নরেন ; তাই ভবিষৎ সম্বন্ধে একটু সজাগ হয়েছে মাত্র। অন্যায় সে করেনি।

চঞ্চলও কয়েকদিনের মধ্যেই বোম্বাই-এর নতুন কারখানার প্রডাকশন চালু করেছে। নতুন সেকশনের উদ্বোধনের দিন কলকাতা থেকে এসেছেন হরিনারায়ণবাবু। তিনিও ফ্যাক্টরীর কাজ প্রডাকশন দেখে খুশী হন।

দেখেন চঞ্চলের শরীরও যেন ভাল নয়, মনে হয় কঠিন পরিশ্রমই করতে হয়েছে তাকে নির্দ্ধারিত সময়ের আগে তবেই এতবড় কাজ শেষ করতে পেরেছে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, তোমার কাজে খুশী হয়েছি চঞ্চল। এখানের প্রডাকশনও বেশ উন্নত মানের হয়েছে। সবই হয়েছে তোমার জন্য। এই সেকসনের ভার আমি রামনাথনের উপর দিতে চাই. আশা করি সে ঠিক মত চালাতে পারবে!

চঞ্চল বলে, তা পারবে। ও তো প্রথম থেকেই আছে।

হরিনারায়ণবাবু কি ভাবছেন। তাঁরও কলকাতায় একটা খবরাখবর দেবার চ্যানেল আছে। তাদের মারফৎ জেনেছেন চঞ্চলের সেই বন্ধুরা এখন কে কোথায় চলে গেছে। কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র কোথাও কাজকর্মের সন্ধানে গেছে, না হয় যত্রতত্র কাজ পেয়েছে, সুতরাং তারা আর ঝামেলা করবে না। চঞ্চলের সেই সঙ্গীরা বেপাত্তা, আর চঞ্চলও যে কাজের লোক সেটা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এবার ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

হরিনারায়ণবাবু বলেন,তুমিও কলকাতায় ফিরে চলো। সেখানেও এমনি একটা প্ল্যাণ্ট বসানোর প্রোগ্রাম নিতে হবে। এখানে তোমার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে।

আজ চঞ্চলও এখান থেকে চলে যেতে চায়।

কেন জানে না একটা দুঃসহ জ্বালা-ঘৃণা তার বুক ঠেলে ওঠে, একটা মেয়ে তার রূপ যৌবনের মোহে চঞ্চলকে এইভাবে ঠকিয়ে যাবে তা ভাবতেও পারেনি চঞ্চল।

যাবার কথায় বলে সে, তাই চলুন।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, গৌর, তোদের মালপত্র গোছগাছ করে

নে। কালই সকালের ফ্লাইটে কলকাতা যাচ্ছি আমরা।

গৌর যেন এখানে বন্দী হয়েছিল। এসে অবধি ওই তিনমূর্তির কাণ্ড দেখেছে। তারাই যেন এ বাড়ির বাতাসকে বিষিয়ে দিয়েছিল। তবু যদিও বা চঞ্চলদা ঘর বাঁধতে চাইল, একটা কালো হাত যেন সব চেষ্টাকে চুরমার করে দিল। সে হাতটা সঠিক কার তা বুঝতে না পারলেও কিছুটা অনুমান করতে পারে গৌর। যতটুকু মানুষ চিনেছে সে তাতে পরিষ্কার মনে হয় লক্ষ্মী বৌদি ওই ধরনের মেয়ে নয়। ওর সম্বন্ধে যা দেখানো হয়েছে সেটা মিথ্যেই। ওই সাজানো মিথ্যের ওপর ভিত্তি করেই চঞ্চলদা এতবড় সর্বনাশ করেছে নিজের আর ওই শান্ত নম্র মেয়েটিরও।

গৌর ওই ঘটনার পর নিজে তবু গেছল রামনাথনের বাসায়, বৌদির সঙ্গে দেখা করতে। তবু যদি একটা সুরাহা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর দেখা পায়নি ওদের।

সেইদিন সকালের ট্রেনেই লক্ষ্মীবৌদি ওর বাবার সঙ্গে মাদ্রাজের গ্রামে চলে গেছে।

গৌর ফিরে এসেই বিকেলে ওই তিনমূর্তিকে গাড়িতে তুলে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা দুয়েক আগেই ভি টি স্টেশনের প্লাটফর্মে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

কিছুদিন আগে যদি ওদের এইভাবে কাবার করতে পারতো চঞ্চলদার জীবনে এমনি বিপর্যয় আসতো না।

আজ হরিনারায়ণবাবুর ওই ফিরে যাবার প্রস্তাবে তাই গৌর যেন মুক্তির স্বাদ পায়। বলে সে, বাঁচলাম! এই বোম্বাই শহরে মানুষ যে কি করে বাস করে? বাবাঃ!

দীর্ঘ প্রায় ছ'মাস পর চঞ্চল বাড়ি ফিরছে।

মনোরমা গেছে এয়ারপোর্টে।

চঞ্চল এসে প্রণাম করে মাকে।

মা দেখছে ছেলেকে। মায়ের সন্ধানী দৃষ্টিতে চঞ্চলের দেহের সব ক্লান্তি, মনের সব শূন্যতা যেন ফুটে ওঠে। মা বলে, চেহারার এ কি হাল করেছিস রে চঞ্চল!

পাশেই গৌরকে দেখে বলে মনোরমা, কি রে! দুটিতে তো বেশ

ঝুলঝাড়া অবস্থায় ফিরেছিস। কি করতিস ওখানে? মিস্ত্রীগিরি?

গৌর বলে, চঞ্চলদা তো কাজ নিয়েই পড়ে থাকতো, ওকে বলে কাজ বাংলোয় আনতে হতো। বলে সময়মত কাজ শেষ না করতে পারলে বদনাম হবে।

—খুব কাজ করেছিস দেখছি।

মনোরমাকে গৌর অবশ্য ওই সব আনসান কথা বলে থামাবার চেষ্টা করে। চঞ্চলও বিশ্বাস করতে পারে গৌরকে। ছেলেটা তাকে খুব ভালোবাসে, তাকে বিপদে ফেলবে না, চঞ্চল বোম্বাই-এর সেই লক্ষ্মীর কথা, তাদের বিয়ের কথা সব বেমালুম গোপনই রাখতে চায়। এত বড় অপমান, লজ্জার কথাটা কে ভুলতে চায়।

তাই এখানে এসে দিন দুয়েক বিশ্রাম নিয়েই বলে বাবাকে, এখানের অফিসে বের হতে চাইছি কাল থেকেই বাবা।

মনোরমা সকালে চা খাচ্ছিল, ছেলের কথায় বলে, সে কি, ওই বোম্বাই-এ ক'মাস দিনরাত খেটে এই অবস্থায় ফিরলি। ছুটিও তো নেয়।

চঞ্চল ক'দিনেই বাড়িতে বসে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। কর্মহীন মুহূর্তগুলো ভরে ওঠে অপমান আর গ্লানিতে। একটি সুন্দর মুখ যেন বার বার কি তীব্র উপহাসের ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

চঞ্চলের সারা মন কি এক তীব্র জ্বালায় ভরে ওঠে, গ্লানিতে বিবর্ণ হয়ে যায়। বের হয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে।

সেই নরেন, প্রকাশদেরও আজ দেখা দিতে মন চায় না। ওদের কাছে বরাবর চঞ্চলের জন্য একটি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার আসন ছিল। তাদের সামনে সেই মেয়েটি চঞ্চলকে চরম অপমান, অবহেলা করেছিল, ওদের কাছেও যেন করুণার পাত্র হয়ে উঠেছে। তাই সেখানেও যাবে না সে। যায়ওনি। একাই গাড়ি নিয়ে গঙ্গার ধারে না হয় লেকের নির্জন গাছের ছায়ায় বসে বিকেলের ম্লান আলোকে মুছে যেতে দেখেছে। কোন বার-ক্লাবেও যেতে মন চায় না।

সব এড়িয়ে সে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। আলোও জ্বালেনি। অন্ধকারে ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে থেকেছে।

ব্যাপারটা দেখেছে মনোরমা। এগিয়ে আসে, আলোটা জ্বেলে শুধায়, শরীর খারাপ? কি রে চঞ্চল?

চঞ্চল মায়ের কথায় বলে, কই না তো!

—চুপচাপ বসে আছিস?

—এমনিই!

কেমন বিচিত্র ঠেকে মনোরমার।

আজ চঞ্চলকে অফিসে যাবার কথায় বলে, ক'দিন বিশ্রাম নে, শরীরটাও ভালো নেই।

চঞ্চল বলে, ভালোই আছি মা। কাজে নামলে সব ঠিক হয়েযাবে।

মহাশ্বেতার এখন কাজের চাপও বেড়েছে। আবার ওই ছোট সাহেবের চেম্বারটা ঝাড়-মোছ করা হচ্ছে। ক'মাস ওটা বন্ধই ছিল।

বেয়ারা পরিতোষ বলে, ছোটসাহেব ফিরেছেন বোম্বাই থেকে। এখানেই বসবেন এখন। এবার আপনার কাজও বাড়লো। আর দেখেছেন তো ছোটসাহেবকে। সাহেবী মেজাজ।

মহাশ্বেতা বলে, কাজে ফাঁকি দিলে মেজাজ দেখতেই হবে। ওটা তো ভালোই পারো।

পরিতোষ অবশ্য এমনিতেই ফাঁকিবাজ। কাজ যত না করে বক বক করে তারও বেশী। তাই মহাশ্বেতার কথায় বলে, আপনিও এই কথা বলছেন দিদিমণি!

হাসে মহাশ্বেতা, কেন? মিথ্যে কথা বলছি নাকি।

পরিতোষ জানে এই দিদিমণির কথা খোদ বড়সাহেব অবধি মানে। তাই বলে, না না, আপনি কেন মিছে কথা বলবেন।

মহাশ্বেতা বলে, যাও, ঝটপট কাজ শেষ করে নাও, ফোনের লোকজন আসবে, সব ফোন দেখে নিতে হবে। আমাকে ডাকবে।

মহাশ্বেতার ফাইন্যাল পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। এসময় আবার চঞ্চল এসে বসায় কাজের চাপও বাড়বে। কিন্তু কি করা যায়, চাকরি বলে কথা। তাই মাঝে মাঝে এই দশটা-পাঁচটার ঘানি থেকে মুক্ত হবার পথই খুঁজছে সে! ভালো ভাবে ল পাস করতে পারলেই একটা পথ পাবে সে। তাই ভালোভাবে পাস করতে হবে! বাবার মুখটা ভেসে ওঠে মহাশ্বেতার মনে।

বাবাও আশা করে, তুই চাকরি করবি না মা। তুই অ্যাডভোকেট হবি। মস্ত বড় অ্যাডভোকেট। আমি যা পারিনি—আমার সেই কাজ

তুই করবি মা। আইনের বিচার গরীব নিপীড়িতদের কাছে পেঁছে দিবি।

শেখর সেন বলে, বুঝলি মা, আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষরাই সব কর্তৃত্ব, আইনের সুবিধা, সব ক্ষমতা, অর্থ নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। তারা চায় না—তাদের সাম্রাজ্যে কেউ অনুপ্রবেশ করুক। ওই অর্থবানরা এমনি স্বার্থপর বলেই যে বিচারে তাদের কাছে গরীবদের কিছু প্রাপ্য হয়, সেই বিচারকে ওরা কিনে নেয়। বড়লোকদের জন্যই সমাজে এই বঞ্চনা।

মহাশেবতা হাসতে হাসতে বলে, তোমার বন্ধু ওই হরিনারায়ণ-বাবুও তো বড়লোক। তিনি তো এমন নন বাবা!

শেখর সেন বলে, এ ব্যক্তিবিশেষের কথা নয় মা, শ্রেণীবিশেষের কথা। আর স্বার্থে ঘা লাগলে সব মানুষই ক্ষেপে ওঠে। কারও স্বার্থটা একটু বেশী সোচ্চার। কারো কম। মাত্রার তফাত মাত্র। কিন্তু মূলত সব একই। তাই তোর গতিপথও শক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তোকে।

হঠাৎ বেজে ওঠে ইণ্টারকম ফোনটা সুরেলা শব্দে। আজকাল কাজের মধ্যে চমকে দেবার মত শব্দে ফোন বাজে না। কঠিন ডাকটাকেও শ্রুতিমধুর করে তুলছে ফোন কোম্পানীগুলো।

মহাশেবতা ফোন তুলে একটু অবাক হয়। ছোটসাহেবের গলা।

মহাশেবতা বলে, আসছি স্যার।

দীর্ঘ ছ'মাস পর দেখছে মহাশেবতা চঞ্চলকে। ক'মাসের কঠিন পরিশ্রমে ওর শরীরটা একটু কঠিন হয়ে উঠেছে। তবে কাঠিন্যের মাঝে কিছুটা ব্যক্তিত্বও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মহাশেবতা বলে, বোম্বাই-এর কাজ ভালোই করেছেন। বিফোর সিডিউল প্রডাকশন চালু হয়েছে।

চঞ্চল দেখছে মহাশেবতাকে। কেমন যেন চমকে ওঠে। ওর চোখ-মুখ-নাক ওই চাউনিটাকে এতদিন ভালো করে দেখেনি। আজ দেখে মনে হয়, অমনি—ওই মেয়েদেরই একজন তাকে রূপের মোহে, নাচের ছন্দে, দেহের নেশায় ভুলিয়ে চরম অপমান করে গেছে। ওদের সে আজ যেন ঘৃণা করে। ওই হাসিটা তার ভালো লাগে না।

চঞ্চল কঠিন কণ্ঠে বলে, দুটো ফাইলে নোট নিন, আমাদের পারচেজ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জকে বলবেন যেন আমার কাছে ইনকমপ্লিট ফাইল না পাঠান। হোয়াট ইজ দিস্!

চঞ্চল বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে কথাটা শেষ করে ফাইলটা মহাশ্বেতার সামনে ফেলে দিয়ে বলে, এসব দেখতে হবে আমাকে?

মহাশ্বেতা চুপ করেই অপমানটা হজম করে নোট নিতে বসলো।

আজ তারও মনে হয় এতদিন চাকরি করছে এখানে এমন ব্যবহার সে পায়নি।

মুখ বুজে নোট নিয়ে বের হয়ে আসে স্টোরের ফাইলটা নিয়ে। ইনচার্জকে দেখিয়ে বলে মহাশ্বেতা, ফাইলপত্র ঠিকমত করে পাঠাবেন সাহেবের ঘরে। আপনাদের জন্য আমাকে কথা শুনতে হবে?

ইনচার্জ মুখ নীচু করে থাকে।

ডিসুজা বলে, তোমার ছোট সাহেবের মেজাজ দেখছি খুব কড়া! বোম্বাই থেকে ফিরে দেখছি একেবারে বদলে গেছে।

মহাশ্বেতা জবাব দিল না। টাইপ করতে থাকে মুখ বুজে। চিঠিগুলো টাইপ করে, ফাইলে পুরে সই করতে পাঠায় বেয়ারাকে দিয়ে। পারতপক্ষে নিজে না ডাকলে যেতে চায় না চঞ্চলের ঘরে।

চঞ্চলও লক্ষ্য করেছে সেটা। বেয়ারার হাতেই চিঠিগুলো সই করে পাঠায়।

হরিনারায়ণবাবুর ফোনটা বাজে!

—আসছি স্যার!

মহাশ্বেতাকে ঢুকতে দেখে হরিনারায়ণবাবু বলেন, বোসো। পারমার কোম্পানীর মাল কেনার ব্যাপারে ওই ফাইলে চঞ্চল নোট দিয়েছে কেনা যেতে পারে।

ঘাড় নাড়ে মহাশ্বেতা, হ্যাঁ। তাই তো দেখলাম।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, কিন্তু ওরা ব্ল্যাক লিস্টেড কোম্পানী। তুমি জানাওনি ওরা আমাদের নীচু মানের মাল দিয়েছেন আগে।

মহাশ্বেতা বলে, উনিও একজন ডিরেক্টার, ওনার হুকুমের ওপর আমি কর্মচারী হয়ে বিরুদ্ধ মন্তব্য করবো স্যার যদি কিছু মনে করেন—

হরিনারায়ণবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি উত্তরটার মধ্যে আরও

কিছু রয়েছে তা বুঝেছেন। চঞ্চলের মেজাজটাও কেমন বদলে গেছে তা দেখেছেন। শুনেছেন অফিসেও স্টাফদের কড়া কথা বলছে।

হরিনারায়ণবাবুর মনে হয় চঞ্চল মহাশ্বেতাকেও তেমনি কিছু বলেছে হয়তো। তাই চুপ করে থেকে বলেন, ঠিক আছে, ফাইলটা আমিই কল করছি, পাঠিয়ে দাও। চঞ্চলকে ওই অর্ডার ক্যানসেল করতে বলা দরকার।

মহাশ্বেতা চুপ করে বের হয়ে আসে।

হরিনারায়ণবাবু মহাশ্বেতার থমথমে মুখ দেখেই বুঝেছেন কিছুটা। চঞ্চলের যেন একটা কিছু হয়েছে, কি তা সঠিক তিনিও বুঝতে পারেন না।

সেটা চঞ্চল নিজেও বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে সেইঅপমানের কথাটা মনে পড়লে সারা মন তার কি দুঃসহ বিরক্তিতে ভরে ওঠে। তখন ওইভাবে কথা বলে চঞ্চল। ওই মহাশ্বেতাকে ডেকেও তার মনে যেন অমনি একটা ঝড় উঠেছিল। পরক্ষণেই মনে হয়েছে চঞ্চলের সে অন্যায়ই করেছিল। মহাশ্বেতাকে ওভাবে কথা বলা তার ঠিক হয়নি। জানে সে বাবাও তাকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন।

চঞ্চল ওসব ভোলার জন্যই কাজে ডুবে যেতে চায়। ফাইল, ব্লুপ্রিণ্টগুলো দেখছে। মনে পড়ে তার সেই রাতের বৃন্দাবন গার্ডেনস-এর কথা। আলোয় রং-এ আর নানা রং-এর ফোয়ারার বিন্যাসে যেন কোন স্বর্গপুরীর পরিবেশ আনে সেই রূপ জগতের মাঝে সে আর লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীও যেন ওই ঝরণার মত কলহাস্যমুখরা হয়ে ওঠে। তার সুগঠিত দেহে জাগে নৃত্যের ছন্দ। সেই রাতে লক্ষ্মী নিজেকে তুলে ধরেছিল তার সামনে নিঃশেষে।

চঞ্চলও হারিয়ে গেছল সেই রূপজগতের অসীমে।

—স্যার!

হঠাৎ কার ডাকে চাইল চঞ্চল।

চমকে ওঠে সে মহাশ্বেতাকে দেখে।

—তুমি!

মহাশ্বেতা বলে, ছ'টা বাজে, বের হবেন না?

খেয়াল হয় চঞ্চলের। বলে সে, এতক্ষণ কি করছেন?

মহাশ্বেতা বলে, বস রয়েছেন, আমি যাই কি করে!

চঞ্চল দেখছে ওকে। বলে, খুবই ফেইথফুল কর্মী দেখছি। কিন্তু মেয়েদের ওপর বিশ্বাস করা মুশকিল।

মহাশ্বেতার কথাটা ভালো লাগে না। ওই চঞ্চলকে দেখেছে, ও যেন তার বাবার একেবারে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। হরিনারায়ণ-বাবু কথাবার্তায় খুবই ভদ্র। অপরের কথা ভাবেন। হৃদয়বান ব্যক্তি। কিন্তু চঞ্চলের মনে কোথায় একটা চাপা অহংকার আছে। যেটাকে ব্যক্তিত্ব বলে চালাতে চায়।

মহাশ্বেতার মনে ওই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাটা ঝড় তুললেও সে সংযত কণ্ঠে বলে, অবিশ্বাসের মত কিছু পেয়েছেন কি?

চঞ্চল বলে, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য! গুড নাইট!

কথাটা মহাশ্বেতার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তার জবাবের অপেক্ষা না করেই বের হয়ে গেল চঞ্চল।

মহাশ্বেতা এমনি চাপা ধরনের মেয়ে। আর নিজের সম্মান সম্বন্ধে ও খুবই সচেতন। তাই ক্রমশঃ মনে হয়েছে হরিনারায়ণবাবুর অফিসে এতদিন চাকরি করছে কিন্তু এমনি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি।

মনে হয় চঞ্চলের কাছে চাকরি করা তার চলবে না।

তাই মহাশ্বেতা তার পড়ার জন্যই বেশী তৈরী হয়।

হরিনারায়ণবাবু আসেন সন্ধ্যার পর। সেদিন দাবার আসরও বসে। তিনিও শুধান, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে মহাশ্বেতা?

শেখর বলে, পড়ছে তো। দেখি রাত একটা অবধি পড়ে!

হরিনারায়ণবাবু চাইলেন, বল কি! না না, অফিসের খাটুনি, তার ওপর রাত্রি জাগরণ, পড়া—এত ধকল সইবে না। তার চেয়ে তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে। ছুটি নাও পরীক্ষার মাস দু'তিন আগে।

শেখর বলে, তাই নিবি।

মহাশ্বেতা জানায়, দেখি, তখন ভাবা যাবে।

মহাশ্বেতা পড়তে বসেছে রাত্রে। বাবা ওঘরে শুয়েছে। আইনের জটিল পয়েন্টগুলো নিয়ে ভাবছে সে। কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে পড়ে চঞ্চলের কথাগুলো, মেয়েদের বিশ্বাস করা যায় না।

তাকেও তাই অবিশ্বাস করে চঞ্চল !

চঞ্চলের কাছে আজ যেন সব কেমন অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্লাবে যায় মাঝে মাঝে অফিস থেকে। অভিজাত ক্লাব—এখানে মেলামেশার মাধ্যমেও ব্যবসার ডিলই হয়।

সোসাইটির অনেকেই আসে। ওদিকে বারও রয়েছে।

উঁচুতলার ছেলেমেয়ে—আর বেশকিছু বয়স্কা মহিলাও আসেন। প্রসাধানের প্রাচুর্য আর পোশাকের স্বল্পতা সহজেই চোখে পড়ে চঞ্চলের। মিস শেলী নাগ কোন নামী কোম্পানীর ডিরেক্টর—বয়সের তুলনায় ছেলেমানুষি ভাবটা এখনও যায়নি। এখনও নিজেকে কুড়ি-বাইশ বছরের তরুণীই মনে করে।

—বাই চঞ্চল।

চঞ্চল সুইমিং পুলের একপাশে একটা ফাঁকা টেবিলে বসেছে দু'পেগ হুইস্কি নিয়ে। এখন আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই। তারাও আর চঞ্চলের খবর নেয়নি। তারা বোধহয় ভাবছে চঞ্চল বোম্বাইয়েই রয়েছে।

চঞ্চলও অতীতের সেই ঘটনাকে ভুলতে চায়, তাই তার সঙ্গী-দেরও এড়িয়ে চলছে।

মিস শেলী নাগ এসে ওর পাশেই বসে পড়ে একেবারে গা ঘেঁষে। শ্লিভলেশ ব্লাউজের নিবিড় বাঁধনে তার শিথিল বুকেও যেন উন্নত উদ্ধত হয়ে উঠেছে।

প্লাক করা ভ্রু তুলে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপের চেষ্টা করে বলে মিস্ নাগ মাঝে মাঝে আসো দেখি, কথা বলারও সময় পাইনা। কদিন লেডিজ ক্লাবের সোস্যাল ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। একদিন এসো না আমার ওখানে। যে কোন রবিবার, আমার ফার্মও দেখে আসবে। শান্ত নির্জন সবুজ কথার মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে শেলী।

ওর দেহের সুরভি যেন চঞ্চলকে আবিষ্ট করতে চায়।

চঞ্চলের মনে পড়ে বোম্বাইয়ের সেই দিনগুলোর কথা। মনে যেন ঝড় ওঠে তার। একটি মেয়ে তাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছিল, আজ তাদেরই একজন এগিয়ে আসছে আবার।

উঠে পড়ে চঞ্চল !

অবাক হয় মিস নাগ, এ কি ! উঠলে যে ! আমার কথার জবাবও দিলে না ?

বলে চঞ্চল, জরুরী কাজ আছে । আজ চলি ।

মিস নাগ ওর দেহের কাছে এসে বলে, কবে আসছো ?

—জানাবো ।

কোনরকমে বের হয়ে যায় চঞ্চল । এড়িয়ে গেল মিস নাগকে ।

ওদিকে দাঁড়িয়েছিল মিঃ দত্ত ।

সেও দেখছিল ব্যাপারটা । চঞ্চলকে বলে গলা নামিয়ে, ওই শেলীর সেলারে প্রচুর বিলিতী মদের স্টক আছে । অতিথি সৎকার ভালোই করে । আজ তোমার পালা । গেলে না কেন ? হ্যাভ এ চান্স ।

চঞ্চল জবাব দেয় না । বের হয়ে যায় ।

তার মনে যেন একটা নীরব বঞ্চনার জ্বালাই তার সব চিত্ত-বৃত্তিকে বিকৃত করে দিয়েছে ।

মনোরমাও দেখেছে ছেলেকে ।

কখন ফেরে ঠিক নেই । না হয় অফিস থেকে একাই ঘরে এসে বসে থাকে ।

মনোরমা শুধোয় গোরকে, কি ব্যাপার রে চঞ্চলের ! তোকে কিছু বলে না ?

গোর অনুমান করে চঞ্চলের সেই ব্যাপারটাই এখনও চঞ্চলকে বেদনা দেয় । কিন্তু মাসীমাকে কিছু জানাতে পারে না ।

মাসীমার কথায় বলে নিপাট ভালোমানুষের মত, কই না তো ।

মরোরমা বলে—তুই তো ওর সঙ্গে থাকিস ! কোন মেয়ের সঙ্গে মেশেটেশে ?

—না তো ! গোরও দেখেছে এখন চঞ্চল মেয়েদের যেন এড়িয়েই চলে । আগেকার মত হৈচৈও করে না । বন্ধুরাও কেটেছে ।

মনোরমা তাই ভাবনায় পড়ে ।

সেদিন রাত্রে হরিনারায়ণবাবুকে বলে, চঞ্চলের এবার বিয়ে-থা দেবার কথা ভাবো । বিয়ের বয়সওতো হয়েছে । একমাত্র ছেলে, ঘরে বৌ আনবো না ?

সারাদিনের কাজের পর হরিনারায়ণবাবুর ব্যক্তিগত সময় বলতে

এইটুকুই। স্ত্রীর কথায় যেন ব্যাপারটার খেয়াল হয়।

—তাইতো! মন্দ বলনি। তোমার ছেলেকে বলে দ্যাখো।

মনোরমা তাই কথাটা পাড়ে পরদিনই সকালে।

চঞ্চল চুপ করে থাকে।

গৌরও ছিল কাছেই। সেও বলে, তাই ভালো মাসীমা। ঘরে বৌ না হলে মানায়!

চঞ্চল বলে ওঠে, তাহলে গৌরেরই বিয়ে দাও মা, নতুন বৌমার সেবাযত্ন পাবে।

গৌর আঁতকে ওঠে।

—ওরে বাব্বাঃ। বিয়ে করবো আমি! আমাকে মেরে ফেলতে চাইছো চঞ্চলদা!

চঞ্চল বলে, তাহলে আমাকে মারতে চাইছিস কেন?

চঞ্চলের কথায় চুপ করে যায় গৌর। কিন্তু মনোরমা বলে, এতে মরার কথা উঠছে কেন? বিয়ে তো সবাই করে। তুইও করবি!

চঞ্চল বিয়ের কথায় আজ চমকে ওঠে।

জীবনে একটা ভুলই সে করেছিল। তার জন্য অনেক দামই দিয়েছে। আর ভুল করতে চায় না সে।

চঞ্চল বলে, যে যা করে করুক। আমাকে এখন বিয়ের কথা বলো না মা!

—বিয়ে করবি না?

মায়ের কথায় বলে সে, না। তা বলিনি। বিয়ের সময় হলেই মত দেব মা। এখন থাক।

উঠে পড়ে চঞ্চল।

মনোরমা গজগজ করে, সময় হলেই মত দেব! সেটা কবে, কখন? আমি মলে?

চঞ্চল মায়ের কথার জবাব দিল না।

উঠে পড়ে সে। বের হয়ে যায়। গৌর দেখছে চুপ করে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন স্ত্রীকে, এত চটছো কেন? আজ বললে, ভাবতে দাও ওকে। ভেবেচিন্তে বলুক না হয়।

মনোরমা বলে, তাহলেও তো বাঁচি।

গৌর দেখছে চঞ্চলকে।

চঞ্চল বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছে। গৌর বলে, মাসীমাকে ওভাবে কথা না বললেও পারতে!

চঞ্চল গৌরকে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদাও রেখেছে গৌর।

চঞ্চল ওর কথায় বলে, তুই তো সব জানিস! তারপরও আবার বিয়ে করতে বলিস?

গৌর বলে, একটা কেস কেলো হয়ে গেছে তাই বলে সব কেসই কি কেলো হবে! আর চুপচাপ থাকো—অফিসেও শুনি মেয়েদের কড়া কথা বলো। আরে বাবা - বাস করতে গেলে সবই মেনে নিতে হবে। বিয়েও। নাহলে এইভাবে চলবে?

চঞ্চল বলে, অফিসের সব খবরই তো রাখিস দেখি! তা ওই মেয়েদের ধমকাই কে বলেছে তোকে? বল্?

গৌর বলে, তোমার মাথার ঠিক নেই। বলি আর তার চাকরি যাক!

—তোর চাকরিই যদি যায়?

চঞ্চলের কথায় গৌর বলে, ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়। আমার চাকরি রইল আর গেল ভাববে তুমি। আমার বয়ে গেছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, আরে বাব্বা! দশটা বাজে! সাহেবেরই লেট!

চঞ্চল বলে, তাই তো! মা ওই সব আন্সান কথা বলে লেট করিয়ে দিল! চল্!

আসছে ওরা অফিসের দিকে।

অফিস টাইমের পথঘাটে ভিড় শুরু হয়েছে। মহাশ্বেতাকে সকালেও কিছু পড়াশোনা করে রান্নার কাজের তদারক করে বাবাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে বের হয়।

আজ দেরিই হয়ে গেছে।

বাস ট্রামে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাদুড়ঝোলা হয়ে ঝুলে যাচ্ছে অফিস যাত্রীরা। তারই মাঝে মেয়েদেরও বাসে ট্রামে উঠতে হয়। আর তার জন্য কি ব্যাপারটা সইতে হয় তা মেয়ে যাত্রীরা জানে।

মহাশ্বেতাকে সেই অপমানও সইতে হয়। তবুও আজ সে

উঠতেও পারেনি।

অপেক্ষা করছে পরের ট্রামের জন্য।

হঠাৎ কাছেই গাড়িটাকে থামতে দেখে চাইল মহাশ্বেতা। তাদের ছোট সাহেবের গাড়ি।

চঞ্চল পিছনে বসে আছে। কি ইংরাজী ম্যাগাজিন পড়ছে। চঞ্চলও গাড়িটাকে হঠাৎ পথের ধারে থামতে দেখে চাইল।

গৌর গাড়ি চালাচ্ছিল। ওই ভিড়ে মহাশ্বেতাকে ট্রামে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে সেই-ই গাড়িটা থামিয়ে ডাকছে, দিদি। মহাশ্বেতাদি—আসুন! মহাশ্বেতাও তার ডাক শুনে এগিয়েআসে। তবু একটু শান্তিতে অফিসে যেতে পারবে। কাছে এসেছে গাড়ির।

চঞ্চল ব্যাপারটা দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে গৌরকে বলে, থামলি কেন!

গৌর বলে, মহাশ্বেতাদিকে তুলে নিই।

চঞ্চল কঠিন কণ্ঠে বলে, না! চল্!

অবাক হয়ে গৌর চাইল ওর দিকে! মহাশ্বেতাও এসে পড়েছে।

চঞ্চল বলে ও আসবে, তুই চল্!

বাধ্য হয়ে গৌর গাড়িটার গতি বাড়িয়ে বের হয়ে যায় মহাশ্বেতার মুখের উপর একরাশ পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে। মহাশ্বেতা এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে অবাক হয়েছে। গৌরও। বলে সে, এভাবে পথের মাঝে মেয়েটিকে অপমান না করলেও পারতে।

চঞ্চলের মনে জাগে সেই চাপা রাগটা। বলে সে, মেয়েদের জন্য তোর খুব দরদ না?

গৌর বলে, বড় ভালো মেয়ে মহাশ্বেতাদি। বড় সাহেব ওকে খুব স্নেহ করেন। মহাশ্বেতাদিকে অফিসের সব কর্মচারী, বেয়ারা বয়রা অবধি মানে।

চঞ্চল বলে, তাই আমাকেও মানতে হবে? ও এবার ইউনিয়নের লীডারই হবে। তোদের দরদে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবে।

গৌর জবাব দিল না। কি ভাবছে সে।

মহাশ্বেতা ক্রমশঃ যেন বুঝেছে ওই বড়লোকের ছেলে চঞ্চলবাবু তাকে যেন অপমান আর আঘাতই দিতে চায়। মহাশ্বেতারও তাই যেন জেদ চেপেছে। চঞ্চলকে সেও পাত্তাই দেবে না। দুজনে যেন

একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে।

অফিসে আজ আসতে দেরিই হয় মহাশ্বেতার। বেলা প্রায় এগারোটা বাজছে। গরমে ভিড়ে ঘামে নেয়ে অফিসে ঢুকেছে। মিস ডিসুজা বলে, ছোট সাহেব তোমাকে ডেকেছে শ্বেতা।

মহাশ্বেতার গলা শুকিয়ে গেছে। জল খেয়ে পাঁচ মিনিট বসে একটু ধাতস্থ হয়। আজকাল আসাটাই যেন কঠিন শ্রমসাধ্য হয়ে উঠছে।

চঞ্চল ফাইলটা দেখছিল, কার্পেটের উপর নিঃশব্দ পায়ে মহাশ্বেতা এসে দাঁড়ায়। চঞ্চল দেখলেও মাথা তোলে না। মন দিয়ে ফাইল পড়ার ভান করে, মহাশ্বেতাকে বসতেও বলে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মহাশ্বেতা। সাড়া নেই চঞ্চলের। মহাশ্বেতাও বুঝেছে তাকে ইচ্ছে করেই দাঁড় করিয়ে রেখেছে চঞ্চল। সে ফিরে আসছে।

—চলে যাচ্ছেন যে ? এবার চঞ্চল কথা বলে।

মহাশ্বেতা বলে, আপনি ব্যস্ত, তাই ডিস্টার্ব করিনি।

—বসকে নমস্কার করতে হয় তাও জানেন না ?

মহাশ্বেতার ফর্সা রং তামাটে হয়ে ওঠে। বলে সে, যে নমস্কারের প্রতিনমস্কার করে না—তাকে নমস্কার না করাই সঙ্গত।

চঞ্চল চমকে ওঠে। ও প্রসঙ্গ ছেড়ে বলে এবার, অফিস আওয়ার্স সাড়ে দশটায়—এসেছেন দেখছি এগারোটায়।

—দেরি হয়ে গেল। মহাশ্বেতা কুণ্ঠিত স্বরে বলে।

চঞ্চল জানায়, কোম্পানী এটা অ্যালাউ করবে না। জবাব দিন।

রাগে অপমানে মহাশ্বেতার মন জ্বলে ওঠে। বলে সে, ওয়ান মিনিট স্যার। এক্সকিউজ মি। বের হয়ে আসে মহাশ্বেতা। নিজের চেম্বারে এসে টাইপরাইটারে বসে একটা ছুটির দরখাস্ত টাইপ করে চঞ্চলের ঘরে এসে ওর টেবিলে রেখে বলে,দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত। আজ অফিসে তাই ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। নমস্কার।

বের হয়ে যায় মহাশ্বেতা দরখাস্তখানা রেখে।

চঞ্চল অবাক হয়ে দেখছে। ওই ভদ্র মার্জিত সুন্দরী মেয়েটিকে সে আঘাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে মহাশ্বেতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এতটা সহজে তাকে আঘাত করা সম্ভব

হবে না। দরকার হলে সেও প্রতিবাদ করতে পারে।

কিন্তু গোলমালটা বাধে লাঞ্চের আগেই। আজ কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মিটিং। অডিট পার্টি এসেছে। তাদেরও বেশ কিছু ফাইলে জিজ্ঞাসার কিছু আছে। সেগুলোর সমাধান না হলে মুশকিলে পড়তে হবে। সরকারী প্রতিনিধিরাও এসেছে।

মিটিং-এর আগে হরিনারায়ণবাবু এইসব 'কোয়ারী'গুলোর ফয়সালা করে নিতে চান।

এসব ব্যাপার মহাশ্বেতার নখদর্পণে।

তাই মিস ডিসুজাকে ইনটারকমে বলেন, মহাশ্বেতাকে পাঠিয়ে দাও। জরুরী দরকার।

মিস্ ডিসুজা সব ব্যাপারটা জানে না। মহাশ্বেতা তাকেবলে গেছে—কাজ আছে, চলে যাচ্ছি।

তাই বড় সাহেবকে জানায়, সে তো চলে গেছে স্যার।

অবাক হন হরিনারায়ণ, সে কি।

ফোন করেন তিনি চঞ্চলকেই। চঞ্চল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মহাশ্বেতা যে তার কথার জবাবে এমনি করে ছুটি নিয়ে চলে যাবে তা ভাবেনি। চঞ্চলের অবচেতন মন যেন মেয়েটিকে আঘাত দিয়ে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল।

কিন্তু তার জবাবে মহাশ্বেতা যে এই কাজ করবে ভাবতেও পারেনি। এবার শুনেছে মহাশ্বেতাকে খুবই দরকার।

খোদ বড় সাহেব জানেন এই কম সময়ের মধ্যে ওই জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র মহাশ্বেতাই।

কিন্ত হরিনারায়ণবাবুর কথায় চঞ্চল বলে, সে তো মুখের ওপর ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বাড়ি চলে গেল। একেবারে অবস্টিনেট—

হরিনারায়ণবাবু ছোট বেলা থেকেই মেয়েটিকে চেনেন। জানেন তাকে। তাই বলেন, কি বলেছিলে তুমি?

চঞ্চল কি যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকে বসের কাছে। হরিনারায়ণবাবু কাজের লোক। বলেন, ওসব কথা থাক। আজ কাজটা উদ্ধার করতেই হবে। না হলে দিল্লীর প্রতিনিধি ফিরে গেলে এইসব ঝামেলা মিটোতে আরও ছ'মাস লেগে যাবে। মহাশ্বেতাকে চাই—

চঞ্চল বলে, ও ছাড়া এ কাজ কি হবে না ?

হরিনারায়ণবাবু কথা না বাড়িয়ে ফোনটা কেটে দেন।

বেশ বুঝেছেন চঞ্চল এমন কিছু বলেছে যেটা মহাশ্বেতা পছন্দ করেনি। কি ভেবে গৌরকে খবর দেন তিনি।

গৌর এসে পড়তে হরিনারায়ণবাবু বলেন, এখুনি তুই মহাশ্বেতার বাড়ি চলে যা। ওকে বলবি—

গৌর বলে, তাকে তো অফিসে দেখলাম, পথেও দেখা হয়েছিল। সে এক কাণ্ড। যা ভিড় গাড়িতে, ওকে দেখে গাড়ি থামিয়ে তুলে নিতে গেলাম—তা চঞ্চলদা আমাকে ধমকে উঠলো। ওকে ফেলে রেখেই ওর সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে এলাম।

হরিনারায়ণবাবু ছেলের এই ব্যবহারটাকে সমর্থন করতে পারেন না। চঞ্চল এমনিই। এসব ছাড়া আর কিছু বলেছিল মহাশ্বেতাকে। ওসব ভাবার সময় নেই। তিনি বলেন, ও বাড়ি গেছে। তুই গিয়ে বলবি আমি নিজে ডেকেছি।

কি ভেবে নিজের প্যাডে দু লাইন লিখে দিয়ে বলেন, ওকে গাড়িতে নিয়ে চলে আসবি, যেন দেরি না হয়।

মহাশ্বেতা দুপুরের আগেই বাড়ি ফিরেছে গুম হয়ে।

শেখরবাবু মেয়েকে অসময়ে ফিরতে দেখে বলে, কি হল মা ?

মহাশ্বেতা বাবাকে এসব কথা জানাতে পারে না। বলে সে, ইয়ে, মানে শরীরটা ভালো নেই। চলে এলাম।

শেখরবাবু এখন একটু একটু হাঁটতে পারে। সকালে লাঠি নিয়ে বেড়াতেও বের হয়। আশা রাখে আবার কোর্টে দু-একটা মামলার কনসালটেনসির কাজও করবে।

আর মহাশ্বেতা নিজে অ্যাডভোকেট হবে—সেদিন তার সব আশা স্বপ্ন সফল হবে।

মেয়ের কাছে এসে বলে শেখর, শরীরের দোষ কি। অফিসের এত কাজ, তারপর সংসারের কাজ। রাত জেগে পড়া, কত আর সইবে মা। আর পরীক্ষার ক'মাস বাকি। এবার অফিসে ছুটি নে। চাকরি অনেক হয়েছে। আমি হরিকে বলছি। কি হচ্ছে ? মাথা ধরেছে ?

মহাশ্বেতার মনে হয় এবার পথ তাকেই নিতে হবে। বড়লোকের

ওই অহঙ্কারী ছেলের আন্ডারে চাকরি করতে সে পারবে না। টাকা—প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার মহাশ্বেতার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মহাশ্বেতা বলে, তেমন কিছুই নয় বাবা। এমনি বদহজম-টজম হয়েছে।

বুড়োর ভাবনা যায় না। বলে সে, যোয়ানের আরক খেয়ে শুয়ে পড় মা।

তার একটু পরেই দরজার বেলটা বেজে ওঠে। কাজের মেয়ে দরজা খুলছে,গৌরকে চেনে সে। গৌরকে এবাড়িতে খবরাখবর নিতে পাঠান হরিনারায়ণবাবু।

গৌর বলে, দিদিকে চিঠিটা দাওগে।

—শরীর ভালো নাই ওর।

গৌর ভাবছে, মহাশ্বেতা ঘুমোয়নি, ঘুমোতে পারেনি। গৌরের গলার স্বর শুনে সেও এসে পড়ে। গৌর বলে, নাও দিদি। খোদ বড় সাহেবের তলব, এখুনিই যেতে হবে। আমার উপর অর্ডার হয়েছে গাড়ি নিয়ে যা সঙ্গে করে নিয়ে আসবি আমার চেম্বারে।

মহাশ্বেতার মনে হয় ওভাবে ছুটি নিয়ে চলে আসাটা ঠিক হয়নি, মহাশ্বেতাও রাগের বশেই কাণ্ডটা করেছে। এমন সময় বড় সাহেবের লোক আসতে বলে—যেতে হবে?

গৌর বলে, তাই তো বললেন বড় সাহেব। অফিসে কি সব জোর মিটিং আছে। কাগজপত্রের ঠিকঠিকনা কে দেবে তাই তলব বোধহয়।

মহাশ্বেতা বড়সাহেবকে বিমুখ করতে পারে না। শেখরবাবুও এসে পড়ে, বলে, তোর শরীর খারাপ।

মহাশ্বেতা বলে, তেমন কিছু না। উনি ডেকেছেন।

—তাহলে যা মা। দেরি করিস না।

•

হরিনারায়ণবাবুর চেম্বারে তখন পদস্থ অফিসার দু'একজন, বড়-বাবু মায় চণ্ডলের দৌড় ঝাঁপ শুরু হয়েছে। একরাশ ফাইল এসেছে, বাকী ফাইল কোথায় কোন্ ডিপার্টমেণ্টে সার্কুলেশনে রয়েছে তারও হদিশ মেলে না। দুজন টাইপিস্ট ওই সব ফাইল হাতড়ে 'ডেটা কালেকসন করে টাইপ করছে। ঘড়ি দেখছেন হরিনারায়ণবাবু।

এমন সময় মহাশ্বেতাকে ঢুকতে দেখে হরিনারায়ণবাবু যেন নিশ্চিন্ত হন।

—তুমি এসে গেছ মহাশ্বেতা! হঠাৎ চলে গেলে? চঞ্চল ওদিকে কয়েকটা ফাইলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।

হরিনারায়ণের কথায় মহাশ্বেতা চাইল চঞ্চলের দিকে, চঞ্চলও দেখছে ওকে। মহাশ্বেতা বড় সাহেবকে বলে, শরীরটা ভাল ঠেকছিল না। তাই ছুটি নিয়ে চলে গেছলাম!

—এখন?

—অনেকটা ভালো আছি স্যার।

হরিনারায়ণবাবু বলেন ব্যাপারটা। ওদের আজকের মিটিং-এর অ্যাজেণ্ডার একটা কপি দিয়ে বলেন, এইসব ফাইলের খবর চাই মা। কোনটার কি প্রগ্রেস হয়েছে। ডেটা, ফিগারসও আছে। আর নেট এক্সপিনডিচারের একটা লিস্ট চাই। বাজেট তো করা ছিল, তারও কপি চাই।

মহাশ্বেতা সব দেখে শুনে বলে অন্য অফিসারদের, আপনাদের এ নিয়ে ভাবতে হবে না। ঘণ্টা খানেক সময় দিন, সব হয়ে যাবে

হরিনারায়ণবাবু বলেন, হয়ে যাবে তো!

মহাশ্বেতার এসব খবর জানা। সেই অন্যসব দরকারী ফাইলের মুভমেণ্টেরও খবর রাখে। বাজেট-এক্সপিনডিচার ফাইলের জরুরী চিঠির কপিও থাকে তার কাছে। মহাশ্বেতা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনারা লাঞ্চ করে আসুন। ততক্ষণে সব রেডি হয়ে যাবে। মিটিং তো চারটেয়—তার আগে সব পেয়ে যাবেন।

মহাশ্বেতা কাজে লেগে যায় তখুনিই।

বিকেলের মধ্যে মিটিং-এর আগেই মহাশ্বেতা হরিনারায়ণবাবুকে সব হিসাব তথ্য নিখুঁতভাবে জানিয়ে দেয়। এবং তার মন্তব্যগুলোও বলে দেয়।

চঞ্চল দেখছে মহাশ্বেতাকে, অফিসের সব কাজ ওর নখদর্পণে। হরিনারায়ণবাবু বলেন, তুমি একটু থাকো মহাশ্বেতা। মিটিংএ অন্য কোন পয়েণ্ট উঠলে তার সম্বন্ধেও উত্তর দিতে হবে।

মিটিং শেষ হয় যখন তখন প্রায় ছটা বাজে। হরিনারায়ণবাবুও খুশী হন, দিল্লীর সরকারী প্রতিনিধিদের তিনি সঠিকভাবে বোঝাতে

পেরেছেন সব ব্যাপারগুলো একেবারে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে। তারাও খুশী হয়েছেন। সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতার কথাও দিয়ে গেছেন।

চঞ্চলকেও মিটিংএ থাকতে হয়েছিল, সেও দেখেছে সব ব্যাপারটা। আজ মহাশ্বেতা যদি না আসতো সমস্ত ব্যাপারটাই ভণ্ডুল হয়ে যেত। আর সরকারী মহলে একবার খারাপ ধারণা হলে তার ফল তো মারাত্মক হতো।

মহাশ্বেতা এসে পড়ে সমস্ত ব্যাপারটা নিপুণভাবে সামলে দিয়ে কোম্পানীর সব কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অফিসও বন্ধ হয়ে যায়। মহাশ্বেতা কাজ শেষ করে বাস রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। এসময় অফিস এলাকা প্রায়জনহীন হয়ে আসে। দিনভোর এখানে মানুষজন নানা ধান্দায় ব্যস্ত থাকে। দিন শেষ হলে তারা যে যার আশ্রয়ে ফিরে যায়। অফিস এলাকায় তখন নামে নির্জনতা।

মহাশ্বেতা চলেছে। হঠাৎ গাড়িটাকে থামতে দেখে চাইল। চঞ্চল মিটিং সেরে ফিরছে। গৌর গাড়ি চালাচ্ছে, সেও দেখেছে একলা মহাশ্বেতা চলেছে ট্রাম রাস্তার দিকে। কিন্তু গাড়ি থামায়নি, চঞ্চলই বলে, গাড়ি থামা।

গৌর গাড়ি থামাতে চঞ্চল নেমে পড়ে। মহাশ্বেতাকে বলে সে, উঠে আসুন, বাড়িতে পৌঁছে দেব।

মহাশ্বেতা দেখছে ওকে। আজ ওবেলার কথাটা মনে পড়ে তার, তখন তার নাকের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছল চঞ্চল। মহাশ্বেতা অল্প হেসে বলে, ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না। বাড়ি পৌঁছতে দেরি হলে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। ট্রামে-বাসেই চলে যাবো। গুডনাইট স্যার!

গৌরও দেখছে ব্যাপারটা। চঞ্চল গুম হয়ে এসে গাড়িতে উঠল। গৌর যেতে যেতে বলে, মহাশ্বেতাদি সত্যিই কাজের মেয়ে, বাড়ি-ঘর, নিজের পড়া সব সামলে অফিসেও এত খাটে।

—পড়া! কি পড়ে আবার?

গৌর বলে, ওর বাবা তো মস্ত উকিল ছিলেন, এখন রোগে শয্যাশায়ী। মহাশ্বেতাদি ল' পড়ছে। বাবার মত উকিল হবে। আর

তা পারবে।

চঞ্চল চুপ করে থাকে। মনে হয় একটা ভুলই সে করেছে। আর মেয়েটিও সেই ভুলের জন্য আজ চরম জবাব দিতে পারতো, তা দেয়-নি, তার অফিস ছেড়ে যাবার কারণটা বোধহয় বাবাকেও বলেনি!

চঞ্চল সেটা সম্বন্ধে পরেও নিশ্চিত হয়। কারণ বাবাও এ নিয়ে কোন কথা বলেনি।

পরদিন দেখে চঞ্চল মহাশ্বেতা তার আগেই অফিসে এসে পড়েছে, বস্-এর ঘরে ফাইলগুলো নিয়ে ঢুকে প্রথমেই নমস্কার জানায়, গুডমর্ণিং স্যার!

চঞ্চলকে যেন ইচ্ছে করেই জানাতে চায় যে সে মহাশ্বেতার কাছে স্যারই! তাই কথায় কথায় ওই 'স্যার' শব্দটা মহাশ্বেতা বেশ জোর করে বলে। চঞ্চল চাইল ওর দিকে।

—কিছু বলবেন স্যার!

—চিঠিগুলো নোট নিয়েছেন তো!

—ইয়েস স্যার।

—তাহলে ওগুলো আজই টাইপ করে দিন। আজই ছাড়তে হবে।

—ইয়েস স্যার!

চঞ্চলকে যেন ইচ্ছে করেই সে খোঁচা দিতে চায়। চঞ্চলের মনে রাগটা আরও বেড়ে ওঠে মাত্র।

ল' পরীক্ষার জন্য মহাশ্বেতা সেদিন ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে চঞ্চলকে। চঞ্চল দরখাস্তটা দেখে চাইল মহাশ্বেতার দিকে, বলে সে, দু'মাসের ছুটি!

মহাশ্বেতা বলে, হ্যাঁ স্যার!

চঞ্চল জানায়, অসম্ভব। চাকরি করতে গেলে এভাবে ছুটি নিলে চলবে না। সাতদিনের বেশী ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়।

মহাশ্বেতা বলে, কিন্তু আমার দু'মাসেরও বেশী ছুটি পাওনা আছে স্যার।

চঞ্চল যেন তার সেই আঘাত দেবার মনোবৃত্তি আর প্রাধান্যটা এবার ফিরে পেয়েছে। সে ওই দরখাস্তের ওপর লাল কালিতেই লিখে দেয়, দুঃখিত। দুমাসের ছুটি গ্রাণ্ট করা যাবে না, সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে, দরখাস্তখানা চঞ্চল মহাশ্বেতার সামনে

ছুঁড়ে ফেলে বলে, নোট করে নিন!

মহাশ্বেতার সামনে কাগজটা অবজ্ঞাভরেই ছুঁড়ে দিতে হাওয়ায় সেটা উড়ে চলে যায় নীচে।

মহাশ্বেতার গালেই যেন চড় মেরেছে ওই তরুণটি। মহাশ্বেতা কাগজটা না কুড়িয়েই বের হয়ে এল। চঞ্চলও ওকে এইভাবে অবজ্ঞা করে চলে যেতে দেখে চটে উঠেছে।

মহাশ্বেতা মুখচোখ লাল করে উত্তেজনা চেপে এসে নিজের চেম্বারে ঢুকলো। মিস্ ডিসুজা দেখছে ওকে

—কি হয়েছে মহাশ্বেতা!

মহাশ্বেতা বলে, অভদ্র। ছুটির দরখাস্ত দিলাম বলে কিনা মাত্র সাতদিন ছুটি দেবে দরখাস্তটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে নোট করে নাও!

ডিসুজা দেখছে ওকে। মহাশ্বেতা অফিসের জন্য অনেক করে। খুবই কাজের মেয়ে। জানে সে ল'ফ্যাইন্যাল দেবে। মহাশ্বেতা বলে চাকরি তো ছাড়তামই। নিজের কেরিয়ারের জন্য, সম্মানের জন্য না হয় আগেই ছাড়ছি, আজই!

চমকে ওঠে ডিসুজা, কি বলছো শ্বেতা!

মহাশ্বেতা বলে, আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি।

—বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করো একবার। ডিসুজা বলে তাকে।

মহাশ্বেতা বলে, না! ওরা এক পলিসিতেই চলে। একজন নরম—অন্যজন গরম। আসলে উদ্দেশ্য ওদের একই। তাই আর আবেদন-নিবেদনে যাচ্ছি না। যা করার করেই যাচ্ছি।

মিস ডিসুজা বলে, তা বলে চাকরি ছেড়ে দেবে?

মহাশ্বেতা বলে, আমার আদর্শের জন্য এই কষ্ট স্বীকার করতেই হবে মিস ডিসুজা।

চাকরিতে ইস্তফা দেবার চিঠিটা টাইপ করে ওটা মিস ডিসুজাকে দিয়ে বলে মহাশ্বেতা, আমি যাচ্ছি। আমার ফাইল, চাবি—সব দেখে নিন।

মিস ডিসুজা অবাক হয়, কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ! এই চিঠিটা খাতায় এনট্রি করে পাঠিয়ে দেবেন ওই ছোট সাহেবের কাছে।

মহাশ্বেতা চিঠিখানা দিয়ে ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে গেল অফিস থেকে। আজ তার সামনে কঠিন লড়াই। কিন্তু এ ছাড়া পথ আর নেই। তার আদর্শের জন্য, সম্মানের জন্য মহাশ্বেতা কোন আপোসই করবে না। আর সেই সংগ্রামের নতুন করে শুরু হল আজ থেকে।

চঞ্চল এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই অবাধ্য মহিলার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল অ্যাকসনই নেবে। চাকরি করতে গেলে মাথা নীচু করেই থাকতে হবে।

এমন সময় মহাশ্বেতার ফাইলে ওই পদত্যাগপত্রটা আসতে দেখে চমকে ওঠে চঞ্চল।

ভদ্রমহিলা এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেছেন। চঞ্চল এটা ভাবতেই পারে না।

আর জানে চঞ্চল খবরটা বড় সাহেবের কানেও পৌঁছে দেবার লোকের অভাব নেই। সেই দিনের মহাশ্বেতার চলে যাবার কথাটারও এবার নতুন মানে বের হবে ওদের কাছে। চঞ্চল কি ভাবছে।

আজ বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহাশ্বেতার সুন্দর কঠিন মুখখানা। এত সহজে এমনি ভালো মাইনের চাকরি যে ছেড়ে দিতে পারে তার লোভ যে নেই এটা আজ বুঝেছে চঞ্চল।

মহাশ্বেতা কথাটা এখনও বাবাকে জানায়নি। সময়মত জানাবে। বাবাও জানে পরীক্ষার জন্য ছুটি নেবে সে। সুতরাং এখন অফিস না গেলেও কোন প্রশ্ন উঠবে না। তাকে পড়তেই হবে। যে ভাবে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

শেখরবাবু এখন ডাক্তারের পরামর্শমত রোজ বিকালে পার্কে একটু বেড়াতে বের হয় লাঠি নিয়ে। দুচারজনের সঙ্গে দেখা হয়, কথাবার্তাও হয়। ফলে একঘেঁয়েমি খানিকটা কাটে।

সন্ধ্যা নামছে। মহাশ্বেতা চুপচাপ বসে রয়েছে। হঠাৎ বেলটা বাজতে উঠে আসে। বোধহয় বাবা বেড়িয়ে ফিরেছে।

দরজা খুলেই সামনে চঞ্চলকে দেখে চমকে ওঠে মহাশ্বেতা।

—আপনি!

চঞ্চল এ বাড়িতে বিশেষ আসে না।

আজ তাই তাকে আসতে দেখে বিস্মিত হয়েছে মহাশ্বেতা, বিশেষ করে আজকের ওই ঘটনার পর।

চঞ্চল বলে, ভেতরে আসতে পারি ?

খেয়াল হয় মহাশ্বেতার, আসুন।

বাবার চেম্বারেই বসালো তাকে।

এখন এখানে মহাশ্বেতাই পড়াশোনা করে। বইগুলো ভালো করে সাজানো। টেবিলে কিছু আইনের বই, খাতা। মহাশ্বেতা পড়ছিল ওখানেই।

চঞ্চল আজ এখানে এসে ওই চেয়ারে মহাশ্বেতাকে বসতে দেখে ভাবছে ওরই কথা।

মহাশ্বেতা শুধোয়, হঠাৎ ?

চঞ্চল ওর সেই পদত্যাগপত্রটা নিয়ে এসেছে। বলে, এর জন্যই আসতে হল।

—মানে !

চঞ্চল বলে, আমি আপনাকে অবশ্য মাঝে মাঝে আঘাতই দিয়েছি। ভাবতে পারেন বড়লোকের ছেলের খেয়ালই। কিন্তু মনে হয় সেটা ঠিক করিনি। কারো অন্ন মারতেও চাইনি। অপমানও করতে চাইনি। কিন্তু ভুলই বুঝেছেন আমায়, আর তারই প্রতিবাদে এক কথায় এই চিঠি দিয়ে এসেছেন।

মহাশ্বেতা দেখছে ওকে। বলে সে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। অবশ্য আপনার অধীনে কাজ করি—কিন্তু তাই বলে আমারও বক্তব্য কিছু তো থাকবেই।

চঞ্চল বলে, তা জানি। কিন্তু বিশ্বাস করো, এসব কেমন করে ঘটে গেল তা আমিও জানি না।

হাসে মহাশ্বেতা, জানেন না ?

চঞ্চল মাথা নাড়ে। আজ সত্যিই নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। অফিসের ব্যাপারে তো বটেই—তাছাড়া মহাশ্বেতাকেও যেন তার আরও বিচিত্র মনে হয়েছে। চঞ্চল বলে,বিশ্বাস করো—তোমাকে ঘৃণা নয়, শ্রদ্ধাই করি আজ। অন্যায়ের এমনি ভাবে যে প্রতিবাদ করতে পারে তাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। ভুল আমারই—তাই স্বীকার করতেই ছুটে এসেছি। তোমাকে ঠিক চিনতে পারিনি। জীবনে লড়াই তো করিনি। তাই যারা লড়াই করে পায়ের তলায় মাটি পেতে চায় তাদেরও সম্মান দিতে শিখিনি। আজ তাই মনে হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেখছে চঞ্চলকে।

চঞ্চল বলে, এ চিঠি ফিরিয়ে নিন। আর এ ভুল আমার হবে না।

মহাশ্বেতা চঞ্চলের কণ্ঠে আজ অনুশোচনার সুরই শোনে।

তবু বলে, চাকরিতো ছাড়তেই হবে কয়েক মাস পর। তাই আগেই ছাড়লাম না হয়।

চঞ্চল বলে, তখনকার কথা তখন হবে। আইন পাস করো—তারপর। এখন এই চিঠি ফেরত নিতেই হবে।

মহাশ্বেতা বলে, বড় সাহেব জানতে পারবেন? ভয় নেই, বড় সাহেবকেও কিছুই বলবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

চঞ্চল শোনায়, তা জানি। আগের সেই ঘটনার কথাও বলোনি তুমি। কিন্তু এ তোমার আমার ব্যাপার।

চমকে ওঠে মহাশ্বেতা, মানে!

চঞ্চল বলে, এ চিঠি তুলে যদি না নাও, আমিই নিজেকে অপরাধী ভাববো। কষ্টই পাবো। অবশ্য আমাকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে যদি খুশী হতে চাও—তাহলে বলার কিছুই নেই।

চঞ্চল কি ভাবছে। আজ মনে হয় তার মহাশ্বেতা হয়তো তাকে ক্ষমা করবে না। মেয়েদের নিষ্ঠুরতারই শিকার হয়েছে চঞ্চল আজও।

মহাশ্বেতা কি ভেবে বলে, কিন্তু সামনে আমার পরীক্ষা—

চঞ্চল বলে, তার জন্য কোন অসুবিধাই হবে না। তোমার ছুটি স্যাংশন হয়ে যাবে।

মহাশ্বেতা পদত্যাগপত্রখানা নিয়ে এবার ছিঁড়ে ফেলে দিতে চঞ্চল যেন নিশ্চিন্ত হয়। বলে সে, উঃ, কি ভাবনাতেই না ফেলেছিলে তুমি।

এমন সময় দরজা খুলে শেখরবাবুকে ঢুকতে দেখে চাইল চঞ্চল। শেখরবাবুও চিনেছে।

—চঞ্চল না!

চঞ্চল গিয়ে প্রণাম করে তাকে। দেখছে চঞ্চল ওকে।

—একি শরীরের হাল হয়েছে আপনার?

শেখরবাবু বলে, শোননি বছর খানেক থেকে প্রায় পঙ্গু হয়েই আছি বাবা। সব বোঝা টানছে ওই মহাশ্বেতা।

চঞ্চল নতুন করে দেখছে মহাশ্বেতাকে।

এর মধ্যে মহাশ্বেতা চা সামান্য সন্দেশও এনেছে।

শেখর বলে, এখন এখানেই কাজকারবার দেখছো বলছিল হরি। বাবার যোগ্য সন্তান হও বাবা! ছেলেমেয়েদের ওপরই তো বাবার সবচেয়ে বেশী বড় ভরসা।

চঞ্চল বলে, আজ আসি।

মহাশ্বেতা ওকে গাড়ির কাছ অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে। পথটা নির্জন। এখনও শহরের দাপট এখানে জাঁকিয়ে বসেনি। গাছগাছালি ডোবাও রয়েছে।

চঞ্চল বলে, কাল মিসেস ডিসুজাকে কথাগুলো সব বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। পরশু থেকেই দু'মাস ছুটি ভালো করে পড়াশোনা করো।

মহাশ্বেতা ঘাড় নাড়ে। বলে চঞ্চল, মাঝে মাঝে অফিসে বিকেলের দিকে গেলে খুশী হবো। জরুরী কাজ থাকলে পরামর্শ দিতে পারবে। চলি।

এগিয়ে এসে বড় রাস্তায় পার্ক করা গাড়িতে উঠলো চঞ্চল। মহাশ্বেতা দেখে গৌর গাড়িতে বসে আছে। মহাশ্বেতা বলে, তুমি এখানে বাড়িতে গেলে না? গৌর বলে, এই বনবাদাড়ে গাড়ি ফেলে গেলে কেউ চাকা স্টেপনি না হয় ব্যাটারি খুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে না? তাই পাহারা দিচ্ছিলাম দিদি।

হাসে মহাশ্বেতা, গৌরও সবতাতেই হুঁশিয়ার!

ফিরছে ওরা।

গৌর দেখছে চঞ্চলকে। আসার সময় গম্ভীর হয়ে ছিল, এখন চঞ্চল বেশ হাসিখুশীভাবেই ফিরছে সেটা গৌরের নজর এড়ায় না।

শুধোয় সে, এখানে হঠাৎ এলে? মানে এর আগে তো কোনদিন আসো নি!

চঞ্চল বলে, না। মানে শেখরবাবু কোম্পানীর ল অ্যাডভাইসার তাই একটা জরুরী ফাইল নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলাম। উনি তো বের হতে পারেন না!

গৌর বলে, তা সত্যি। বাঘের মত উকিল গো! একেবারে বসে পড়েছেন, ও'র জেরাতে সাক্ষীর প্যান্টুল 'বাসন্তী কলার' হয়ে যেতো। বুঝলা!

চঞ্চল ওর বিচিত্র ভাষ্যে ধমকে ওঠে কৃত্রিম কোপে, থাম তো! কি যে আনসান বলিস তুই!

চঞ্চল আজ যেন এতদিন পর তার সেই জ্বালাভরা মনের অতলে শান্তির সন্ধান পায়। মহাশ্বেতা তাকে একটা কঠিন দুঃখ ভোগ ও অনুশোচনার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

তার প্রতি অন্যায়গুলোর কথা মনে রাখেনি, আজ নিজের ঘরের ব্যালকনিতে বসে চঞ্চলের মনে হয় ওই চাঁদের আলো ভরা পৃথিবী, শান্ত কবি, ওই প্রকৃতির রূপের অতলে এখনও শান্তি আছে, সৌন্দর্য আছে। হয়তো শান্তিতে বাঁচার আশ্বাস আছে। যে আশ্বাসটুকু এতদিন তার মনে হারিয়ে গেছল।

মায়ের ডাকে চাইল চঞ্চল।

—কিরে খেতে যাবি না?

খেয়াল হয় চঞ্চলের। এতদিন তার নাওয়া-খাওয়ারও ঠিক ছিল না। রাতে কোনদিন কিছু খেত, না হয় একটু দুধ খেয়েই শুয়ে পড়তো।

আজ উঠে পড়ে।

—চলো!

আজ খাবার টেবিলেও তার খাবার আগ্রহটা নজরে পড়ে মনোরমার, ওর জন্য স্টু করে। গৌর মাংস বেশ মশলাদার খেতে ভালোবাসে। চঞ্চল বলে, এসব রোগীর পথ্য ছেড়ে ওই রান্নাই দাও তো মা।

গৌর অবাক হয়, এই মাংস খাবে?

চঞ্চল বলে, কেন! খেতে নেই! দাও তো। আর দুখানা চাপাটিও দাও। লুচি ফুচি রাখো তো!

হরিনারায়ণবাবুও বলেন, হ্যাঁ, হ্যা, এই বয়সে খাওয়ার পার্থক্য মানে মানসিকতারই দৈন্য। ওসব না থাকাই ভালো।

হরিনারায়ণবাবুর কাছে অফিসের সব খবরই পৌছে যায়, তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতার অভাব নেই। তারা চঞ্চলের ওপরও সমান নজরদারি চালায়।

বলে, মহাশ্বেতার সঙ্গে সেইদিন দেরী করে আসার খবর তাই

নিয়ে চণ্ডলের মন্তব্য আর মহাশ্বেতার একদিনের ছুটি নিয়ে যাবার খবরটাও পৌছে গেছল তার কাছে।

আজ চণ্ডলের সঙ্গে ছুটি নিয়ে কথা কাটাকাটি এবং মহাশ্বেতার রেজিগনেশন দেবার কথাটাও তাঁর কাছে পৌছেছিল। তিনি নিজে কিছুই বলেননি, তবে খবরটাতে বেশ চিন্তাতেই পড়েছিলেন। তাঁর বন্ধুর কাছেও যেতে হবে—মহাশ্বেতাকেও চেনেন তিনি। তাই ওঁর মত আত্মসম্মান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়েটি যে চণ্ডলের অন্যায়ের প্রতিবাদে এ চাকরি থেকে পদত্যাগপত্র দিয়েছে তাতে তিনি খুশীই হয়েছিলেন মহাশ্বেতার ওপর।

অথচ মহাশ্বেতাকে তিনি স্নেহও করেন। তবু ব্যাপারটা কোন্ দিকে পরিণতি নেয় দেখার জন্যই চুপ করে ছিলেন তিনি, চণ্ডলকে কিছু বলেননি।

তাই চণ্ডলের এই পরিবর্তনটা দেখে হরিনারায়ণবাবু কিছুটা অবাক হন। কিন্তু কিছু বলেন না।

ভেবেছিলেন পরদিন মহাশ্বেতা আসবে না অফিসে। কিন্তু তাকে স্বাভাবিকভাবে আসতে দেখে চাইলেন তিনি। মহাশ্বেতা কয়েকটা জরুরী চিঠি ওঁকে দিয়ে বলে, কাল থেকে আমার ছুটি স্যাংশন হয়ে গেছে।

হরিনারায়ণবাবু একটু অবাক হন। তবু সহজভাবে বলেন, ভেরি গুড, পড়ার জন্য ছুটি, মন দিয়ে পড়বে কিন্তু, আর কাজকর্ম মিস্ ডিসুজাকে সব দেখিয়ে যাও।

চণ্ডলও এখন যেন বদলে গেছে।

হরিনারায়ণবাবুর মনে হয় চণ্ডল ও মহাশ্বেতার মাঝে কোথায় যেন একটা সমঝোতা হয়েছে।

আর গৌরকেই প্রশ্ন করতে গৌর জানায় কাল সন্ধ্যায় চণ্ডলদা গেছলেন শেখরবাবুদের বাড়িতে, অবাক হন হরিনারায়ণ।

মনে হয় তার মনের জটিল অংকটার উত্তর এবার বের করতে পারছেন তিনি, তবু শুধোন, ওখানে?

গৌর বলে, কি সব ল পয়েণ্টের আলোচনা ছিল নাকি-তাই বললো!

হরিনারায়ণ বলে, ঠিক আছে।

গৌরও বের হয়ে আসে।

মনে হয় তার চঞ্চলদা যেন এবার অন্যকিছু ভাবছে। তাই ভাবুক।

বোম্বাই-এর সেই ঘটনাটায় গৌরও দুঃখ পেয়েছিল। কি যেন একটা সর্বনাশ ঘটে গেছল। আজ আর সেই অতীতের দুঃখ জ্বালা সেও মনে রাখতে চায় না।

তাই চঞ্চলদা যদি আবার নতুন করে বাঁচতে চায় তাকে দোষ দিতে পারে না গৌরও।

চঞ্চল দিনভোর অফিসের কাজে ডুবে থাকে।

কারখানাতে যেতে হয়, সেখান থেকে অফিসে ফিরে কাজকর্ম শেষ করে। গৌরকে বলে দেয়, তুই বাড়ি চলে যা। আমি ক্লাব হয়ে ফিরবো। মাকে বলবি রাত্রি দশটা নাগাদ ফিরবো।

মহাশ্বেতার এখন ছুটি।

সকালেই পড়তে বসে—সেই ফাঁকে বাড়ির কাজকর্মও দেখে। বাবাকে খাইয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পড়তে বসে। একটানা প্রায় রাত্রি আটটা অবধি পড়ে! না হলে সন্ধ্যার পর বসে রাত্রি দুপুর অবধি।

শেখরবাবু বলে. দিনরাত পড়া নিয়েই থাকবি মা। যা একটু ঘুরে আয় বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে।

কোন কোন দিন হরিনারায়ণবাবু আসেন, দুচারটে অফিসের কথা হয়। পলিসি ম্যাটার নিয়েও আলোচনা করেন হরিনারায়ণবাবু।

তিনিও খবর নেন, পড়াশোনা ঠিকমত করছো তো? মহাশ্বেতা কিছু বলার আগে শেখরবাবু বলে, আর বলো না। অফিস বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে ওই নিয়েই পড়ে আছে।

—গুড! নিষ্ঠা চাই মা। তা তোমার আছে। তাই ওই শেখরের চেয়েও বড় উকিল হবে মা! তবে ওই আদর্শ-টাদর্শ আমি ব্যবসাদার মানুষ, ওসব ঠিক বুঝি না। তবে যা বুঝি তাতে মনে হয় এ যুগে ওসব অচল, তাতে ঠকতেই হয়।

শেখরবাবু বন্ধুর কথায় বলে, ওসব আলোচনায় যেও না হরি। তুমি ঠকেছো না আমি জিতেছি তার বিচার হবে যথাসময়ে। এখন

নয়। টাকাটাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নয়!

তারপরই হুঙ্কার ছাড়ে শীর্ণ শেখর সেন।

—রাজা সামলাও। কিস্তী!

দুজনে আবার ঝগড়া থামিয়ে দাবার ছকে মন দেয়।

মহাশ্বেতার বন্ধুবান্ধব এমনিতে কমই।

সে একটু চাপা ধরনের মেয়ে, যারা মনে মনেই রাখে নিজেদের ভাবনা চিন্তাগুলো। নিজের মনের সেই খবর কাউকে জানায় না, ফলে অন্যদের মনের খবরও তার কাছে অজানাই থেকে যায়।

দু'একজন বন্ধু যারা ছিল তারাও কেউ বিয়ে করে চলে গেছে। কেউ জীবনধারণের লড়াইএ কোথাও দূরে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। মনে পড়ে শিখার কথা। কলেজে সেই-ই ছিল তার প্রিয় বন্ধু। কিন্তু মেয়েদের বন্ধুত্ব বড়ই অনিশ্চিত। যাদের পরের ওপর নির্ভর করতে হয় তাদের নিজেদের সত্তারই কোন স্থিরতা নেই, বন্ধুত্বও তাই পলকা! কে কোথায় ছিটকে যায় তার ঠিক নেই।

মহাশ্বেতা নিজের চাকরি, পড়া নিয়েই এখন ব্যস্ত। তাই বাইরের জগৎটা তার সীমিত হয়ে গেছে।

একাকীত্ব তাই প্রবল হয়ে জাগে মহাশ্বেতার মনে। দিনভোর পড়তে ভালো লাগে না। তাই বের হয় বিকেলে। পার্কে একটু ঘুরে বাজারপত্র করে বাড়ি ফেরে।

মনে পড়ে চঞ্চলের কথা। সেদিন নিজে ছুটে এসেছিল তার বাড়িতে। চঞ্চলের মুখে চোখে দেখেছিল মহাশ্বেতা একটা নীরব ব্যাকুলতা।

যেন সে যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত।

আর মনে হয়েছিল মহাশ্বেতার চঞ্চল যেন কি একটা বেদনা জ্বালার নির্মম তাড়নায় ওই ভাবে ব্যবহার করে। তারপর ভুল বুঝে দুঃখও পায়।

তাকে সেদিন ফেরাতে পারেনি মহাশ্বেতা।

তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। দেখেছিল খুশী হয়েছে চঞ্চলও।

পরে সেই-ই তার ছুটির দরখাস্ত নিজে চেয়ে নিয়ে মঞ্জুর করেছে।

ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়েনি। মহাশ্বেতার মনে চঞ্চলের

ওই ভাবান্তরটা যেন প্রশ্ন তোলে। আর চঞ্চলও এই নিয়ে চিন্তা করে এখন!

অফিসে মহাশ্বেতা নেই। তার উজ্জ্বল উপস্থিতি এখনও যেন মনে করতে পারে চঞ্চল।

কদিন ধরেই ভাবছে মহাশ্বেতার কথা।

আজ নিজেই অফিসের ছুটির পর গৌরকে বলে, তুই বাড়ি চলে যা। ক্লাব হয়ে ফিরবো।

গৌর চলে যায়!

চঞ্চল বের হয় গাড়ি নিয়ে।

সন্ধ্যা নামছে। এদিকে পথঘাট এখন নির্জন। গাছগাছালির ছায়া অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। হঠাৎ গাড়িটা পথে দাঁড়াতে দেখে চাইল মহাশ্বেতা। বাজারের দিকে যাচ্ছিল সে।

নামছে চঞ্চল। মহাশ্বেতা অবাক হয়, আপনি। চঞ্চল এগিয়ে আসে। বলে সে, ক'দিন অফিসে যাননি। এই দিকে যাচ্ছিলাম ভাবলাম খবর নিয়ে যাই। কেমন আছেন! পড়াশোনা—

মহাশ্বেতা বলে, বাড়িতে চলুন।

চঞ্চল বলে, আবার বিরক্ত করবো তোমাকে। হাসে মহাশ্বেতা না-না। খুশিই হবো। দিনরাত ওই বাড়ি আর পড়াশোনা নিয়ে মাথা যেন জ্যাম হয়ে গেছে। তবু দুদণ্ড কথা বললে ভালোই লাগবে। চলুন।

মহাশ্বেতার বাড়িতেই এসেছে চঞ্চল।

শেখরবাবু আজ পাড়ার মন্দিরে কোন স্বামীজির ভাষণ শুনতে গেছে। তিনি নাকি গীতাভাষ্যকে অমৃতভাষ্যে পরিণত করতে পারেন।

চঞ্চল বলে, দিনরাত পড়ছো। চলো না এই রবিবার একটু ফাঁকায় ঘুরে আসি। কাজ আর কাজ। একেবারে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। একটা দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ ফেলে পালাবো—তুমিও পড়া ফেলে মুক্তি পাবে। ছুটি নেব দুজনে।

মহাশ্বেতার জীবনে অমনি ছুটির অবকাশও আসেনি। মনে হয় ইটকাঠের কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও উধাও হবে সে। জীবনে কিছু অবকাশেরও দরকার। বলে মহাশ্বেতা, ঠিক আছে।

খুশী হয় চঞ্চল, তাহলে ওই রবিবার সকালে আসছি। তৈরী থাকবে।

গৌরের এখন মাঝে মাঝে বিকেলে ছুটি মিলছে। চঞ্চলদা একাই গাড়ি নিয়ে বের হয়। গৌরও তার পুরনো বন্ধুদের ওখানেও যেতে পারে। কোন কোন দিন দল বেঁধে সিনেমাতেও যায়।

শ্যামবাজারের ফড়েপুকুর অঞ্চলে গৌরের পুরনো বন্ধু ফটিকের চায়ের দোকান। চা-চপ-কাটলেট-টোস্ট এসব বিক্রী করে। তার চপ কাটলেটের কাটতিও খুব।

গৌর মাঝে মাঝে এসে বসে এখন ওখানে। সেদিন সন্ধ্যা নেমেছে। শীতকাল, হঠাৎ একটা লোককে চপ কিনে নিয়ে বের হতে দেখে চাইল। লোকটার পা দুটো ঠিকমত পড়ছে না।

বগলে কাগজে মোড়া একটা বোতল। চমকে ওঠে গৌর! দেখতে দেখতে চার-পাঁচ বছর হবে পার হয়ে গেছে তারা বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছে এখানে। তারপর আর চঞ্চলের বন্ধু সেই তিন মূর্তিকে দেখেওনি। ভুলে আছে তাদের কথা।

চঞ্চলও এখন বদলে গেছে।

গৌর হঠাৎ সেই তিন মূর্তির এক মূর্তিকে দেখে এগিয়ে যায়। আগেকার সেই ঝকঝকে পোশাকও নেই। মুখে গালে উস্কোখুস্কো দাড়ি। গৌরের ডাকে চাইল প্রকাশ!

—প্রকাশদা না?

প্রকাশ এখন যেন অন্য মানুষ। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। তবু দেখছে গৌরকে। চিনতে পারে সে।

—গৌর না?

গৌর বলে, এ কি হাল হয়েছে শরীরের!

প্রকাশ শোনায়, শরীরের দোষ কি ব্রাদার! শালা নরেন একাই মালকড়ি হাপিশ করে চিট করলো। শালাকে সিওর দেখে নেব আমি! শালা এখন বিডন স্ট্রীটে দোকান খুলে জেণ্টেলম্যান হয়েছে। ভালোবাসা স্টোর্স! একটা পয়সাও দেয় না। না দিক প্রকাশের এখনও হাত বাড়ালে পর্বত! মাল ঠিক জুটে যায়!

—এখানে কোথায় থাকো?

গৌরের কথায় বলে, ওই যে ফড়েপুকুর বস্তি, ওখানে কাকপক্ষীকে

গে শুধুলেই দেখিয়ে দেবে প্রকাশ মাস্টারের আস্তানা। এখন নাচ গানের তালিম দিই। কথাকলি! নেশার ঘোরে দুপাক নাচতে গিয়ে গৌরের গায়েই পড়ে সামলে নিয়ে বলে সরি! তারপর চঞ্চলের খবর কি? সেই বড়লোকের বাচ্চার!

—ভালোই।

নেশার বস্তুর ভাগ যদি চায় গৌর সেই ভয়েই প্রকাশ যেন কেটে পড়তে চায়। বলে সে, চলি গৌর!

গৌর শুধোয়, বিমলদার খবর কি?

—জানি না। শালা নরেনের চামচে, 'ভালোবাসা এসটোস্'—বোম্ মেরে উড়িয়ে দেব শুলোদের! ভালোবাসা, পেরেম ছুটিয়ে দেব! হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব শালার!

প্রকাশ টলতে টলতে বস্তির আড়ালে অপ্রকাশিত হয়ে গেল।

গৌর ফিরে আসে বন্ধুর দোকানে। নটবর শুধোয়, ওকে চিনিস! শালা মাতাল খেমটাওয়ালাকে! এককালে খুব কাপ্তেনী করেছে। এখন ফুস্!

চঞ্চল আর মহাশ্বেতা কলকাতার জীবন থেকে মুক্তির পরিবেশে!

ডায়মণ্ডহারবারের এক প্রান্তে নদীর বিস্তার এখানে দিগন্তপ্রসারী। ফোর্টের উঁচুনীচু মাটির ঢিবিগুলোকে ছোট পাহাড়ের মত মনে হয়। হাওয়ায় উড়ছে মহাশ্বেতার চুল, অবাধ্য শাড়ির আঁচল।

চঞ্চল দেখছে ওকে, নীল মেঘমুক্ত আকাশ—দূরে এদিকে সবুজ গ্রামসীমা নদীর বুকে কোথায় দু'একটা পাল তোলা নৌকো ভাটিতে উধাও হয়ে যায় কালো বিন্দুর মত, গাংচিলের ডাক শোনা যায়, বাতাসে ওঠে ঢেউ, মৃদু গুঞ্জন!

এ যেন এক নতুন জগৎ—যা মহাশ্বেতার কাছে এতদিন অজানা ছিল.। খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে মেয়েটি। তার মনে এর আগে এই রূপরসগন্ধবর্ণভরা পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই ছিল না, আজ এক মহান্ রূপে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

চঞ্চল দেখছে ওই নতুন মহাশ্বেতাকে।

ওর শান্ত সুন্দর পানপাতার মত মুখ, ডাগর চোখ যেন কি খুশীতে চঞ্চল। ওর নিটোল দেহে যেন ভরা যৌবনের ফোয়ারা।

মহাশ্বেতা তার মনের এই সদ্যজাগর এক নারীত্বকে আজ আবিষ্কার করেছে, যে অনেক কিছু পেয়ে নতুন করে বাঁচতে চায়।

চঞ্চল বলে, জায়গাটা সত্যি সুন্দর না!

মহাশ্বেতা বলে কলকণ্ঠে সত্যিই সুন্দর, কলকাতায় বন্দী থেকে জীবনের অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হয়, না?

চঞ্চল আজ যেন সব ভুলতে চায়।

মহাশ্বেতাকে দেখছে সে।

হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর একজনের মূর্তি। তাকে আজ চার বছর আগেই ভুলে যাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনের পরতে সে যে এমনি করে বেঁচে আছে আজও এতদিন পর তা ভাবতেও পারেনি, তারা যেন বোম্বাইএর সমুদ্রের ধারে এমনি করে বসে আছে। আর সেই প্রেমের পরিণতির সেই দারুণ অপমান জ্বালাটা ভোলেনি আজও চঞ্চল।

তাই চমকে ওঠে!

মনে হয় মহাশ্বেতা আর সেই লক্ষ্মী ওরা সবাই যেন তাকে অপমানই করবে, তীব্র বঞ্চনায় ভরে দেবে তার মন। এক অজানা আতঙ্কে যেন শিউরে ওঠে চঞ্চল!

মহাশ্বেতা অবাক হয়, কি হলো?

চঞ্চল যেন বদলে গেছে। ওর মুখে চোখে ফুটে ওঠে কি কাঠিন্য। চঞ্চল বলে, না। কিছু না! চল, ফিরতে হবে!

মহাশ্বেতা বলে, সবে তো এলাম।

চঞ্চল উঠে পড়েছে। তার মনে হয় যেন একটা ভুলই করতে চলেছিল সে।

ফিরছে ওরা কলকাতার দিকে। চঞ্চল গম্ভীর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। মহাশ্বেতাও অবাক হয়। চঞ্চলের হঠাৎ এই পরিবর্তনে মনে হয় চঞ্চল কি যেন একটা নীরব যন্ত্রণাকে চেপে থাকার চেষ্টাই করছে। সেটা মহাশ্বেতার নজর এড়ায় না।

চঞ্চল বাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যার আগেই।

গৌর ওর গাড়ির অবস্থা দেখে বলে, কোথায় গেছলে? গাড়ি জল কাদায় মাখামাখি!

চঞ্চল জবাব দেয় না। উঠে গেল ওপরে। গৌর দেখছে ওকে।

কিছুদিন ধরে দেখছে গৌর চঞ্চল একাই বের হয় আর ওর মধ্যে কি যেন একটা ভাঙাগড়াও চলেছে। গৌর দেখে মাত্র।

সেই তিন মূর্তিদের গায়েব হবার পর আজ তাদের একজনকে দেখেছে ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। প্রকাশের কথাতে মনে হয়েছে ওদের তিন-জনের মধ্যে আর ভাব নেই। নরেন যে তাদের ঠকিয়েছে তাও প্রকাশ করেছে ওই প্রকাশ। আর ওরা যেন একটা গোপন কিছু ব্যাপারেও জড়িত। না হলে প্রকাশ কেনই বা শাসায়, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার হুমকিই বা কেন দেয় তা ঠিক বোঝে না। গৌর ভাবছে নরেনকেও দেখা দরকার।

অবশ্য এসব কথা চঞ্চলকে সে জানায় না। ওরা আর ফিরে আসুক চঞ্চলের জীবনে তাও চায় না গৌর।

মহাশ্বেতা সেই দিনের স্মৃতিটাকে ভোলেনি। চঞ্চলের মনের অতলে কোথায় যেন একটা দুঃসহ জ্বালাই রয়েছে, যেটাকে ভোলার চেষ্টা করতে পারছে না সে। পরীক্ষা আসছে সামনে।

মহাশ্বেতা সেদিন পরীক্ষা দিতে বের হবে, হঠাৎ চঞ্চলকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়। কি ব্যাপার ?

চঞ্চল বলে, পরীক্ষা দিতে যাবে তো। চলো তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যাই। ট্রামে-বাসে পরীক্ষা দিতে গেলে ভিড়ের চাপেই সব ভুলে যাবে।

শেখরবাবু বলে, তা যা বলেছ। চঞ্চল ভালোই করেছে এখানে এসে।

সেই দিনের কথাও আর কিছু হয় না। চঞ্চল মহাশ্বেতাকে ইউনিভার্সিটিতে ছেড়ে দিয়ে অফিসে চলে যায়।

মহাশ্বেতা পরীক্ষা দিয়েছে ভালোই। বিকেল হয়ে গেছে। ফেরার কথাই ভাবছে এবার। পথেঘাটে অফিস যাত্রীদের ভিড়। ক্লান্তিও বোধ হয়। বাস-ট্রামে উঠেও লাভ নেই। এখানে যদিবা ওঠা যায় খেলা শুরু হবে এসপ্লানেডে। ওখান থেকে আবার একপ্রস্থ যুদ্ধ করতে হবে। ট্যাক্সির চেষ্টাই করে। কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা নামক শ্রেণীর মেজাজ-মর্জি বোঝার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নেই। ভগবান যদিও কোন প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করে ফেলেন—এরা

তা কদাপিও করেছে কিনা জানা নেই। এখন এক গাড়িতে তিনগুণ রোজকারের আশায় স্যাটেল খাটছে।

হঠাৎ সামনেই গাড়িটাকে দাঁড়াতে দেখে চাইল মহাশ্বেতা।

—উঠে এসো।

চঞ্চল ডাকছে তাকে।

মহাশ্বেতা গাড়িতে উঠে বসতে চঞ্চল বলে, আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। জরুরী কাজ পড়ে গেল অফিসে।

মহাশ্বেতা বলে, আপনি আসবেন তা তো বলেননি!

হাসে চঞ্চল, ব্যাপারটা নিজে তো দেখলাম। ভাবছি এবার হলে আনা-নেওয়ার ডিউটিটা ক'দিন করে নিই।

মহাশ্বেতা বলে, আপনি ব্যস্ত—

চঞ্চল জানায়, ব্যস্ততার মাঝেও এটুকু সময় নিশ্চয়ই করে নিতে পারবো।

পরীক্ষা নিয়ে ক'দিন মহাশ্বেতা খুবই ব্যস্ত রয়েছে। ক'দিন নয়, ক'বছর ধরেই কলেজ, অফিস, পড়াশোনা এই নিয়েই কেটেছে। অনেক পরিশ্রমও করেছে মহাশ্বেতা। এবার সেই পরিশ্রমের শেষ হয়ে আসছে।

শেষের দিন পরীক্ষা দিয়ে মহাশ্বেতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বিকেলের দিকে পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষার পালা চুকিয়ে বের হয়ে আসে মহাশ্বেতা। ওদিকে চঞ্চলের গাড়িটা দেখে দরজা খুলে উঠে ধপাস করে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, বাবা, বাঁচলাম।

—কি হল? চঞ্চল প্রশ্ন করে।

মহাশ্বেতা বলে, ক'বছর ধরে বোঝা টেনে টেনে আজ বোঝা সব নামিয়ে মুক্ত হলাম। পরীক্ষা শেষ এবার।

চঞ্চল বলে, এবার?

মহাশ্বেতা হেসে বলে ওঠে, চলো তো! মনে হয় যেদিকে দুচোখ যায় বের হয়ে পড়ি।

মহাশ্বেতা যেন মুক্তির আশ্বাস পেতে চায়। গাড়িটা চলেছে কলকাতার এলাকা ছাড়িয়ে সবুজের রাজ্যে। আজ মহাশ্বেতার মনে মুক্তির আনন্দ!

চঞ্চলও আজ অনেকখানি সতেজ হতে পেরেছে মহাশ্বেতার

কাছে। সেও ক্রমশঃ এগিয়ে আসে। ওই মেয়েটি কোনদিনই তার কাছে কিছু চায় নি, বরং নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদই করেছে। নিজের যোগ্যতা আছে মহাশ্বেতার।

অন্য মেয়েদের মত অসহায় নয়, তাই অনুযোগ, প্রার্থনা করে না, নিজের সাধ্য দিয়ে জয় করে সে কিছু পেতে চায়।

তাই ভালো লাগে চঞ্চলের মহাশ্বেতাকে। ও পুরুষের কাছে মাথা নোয়াবে না—সমপর্যায় বন্ধুর মতই পাশে দাঁড়াতে চায়।

চঞ্চলের তাই মহাশ্বেতাকে নিরাপদ বলেই ভাবে, সহজভাবে মিশতে পারে বন্ধুর মতই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হরিনারায়ণবাবুও পরীক্ষার খবর নেন ফোন করে। আজ তার শেষ পরীক্ষা।

হরিনারায়ণবাবু গৌরকে অফিসে দেখে বলেন, তোরা বাড়ি যাসনি? চঞ্চল—

গৌরের ক'দিন ড্রাইভারি থেকে ছুটি মিলেছে। আর গৌরও খুশী হয়। চঞ্চলদার মনে যেন এখন অন্য সুর বাজে। সেটা ওর কথায় হাসিতে ফুটে ওঠে।

গৌর অবশ্য খানিকটা অনুমান করতে পারে কেসটা।

হরিনারায়ণবাবুর কথায় সে বলে, চঞ্চলদা ক'দিন সকালে, বিকেলে নিজেই বের হচ্ছে গাড়ি নিয়ে। আজও বিকেলে বের হয়ে গেছে।

হরিনারায়ণবাবু একটু অবাক হন, তাই নাকি! কোথায় যায় সে।

গৌর একেবারে নিপাট ভালোমানুষের মত জানায়, বোধ হয় ফ্যাক্টরীতে যায়টায়।

হরিনারায়ণবাবু আজ নিজে ফ্যাক্টরীতে গেছলেন, সেখানে চঞ্চলকে দেখেননি, তাই বলেন, ফ্যাক্টরীতে যায়?

গৌর কেস গড়বড় দেখে বলে, ঠিক জানি না!

হরিনারায়ণবাবু বলেন, আবার সেই বাঁদর বন্ধুদের সঙ্গে মিশছে না তো?

গৌর বলে, না না।

—তবে?

জেরার মুখে পড়ে গৌর তবু টলে না। বলে সে, কাজেই গেছে।

কোনরকমে সরে আসে সে বড়সাহেবের সামনে থেকে।

হরিনারায়ণবাবু ক'দিন পর এসেছেন শেখরের বাড়িতে। কই মহাশ্বেতা, পরীক্ষা কেমন হলো?

ঢুকছেন হরিনারায়ণবাবু। বসার ঘরে শেখরবাবু বসে বসে পেসেন্স খেলছিল তাস নিয়ে। বন্ধুকে দেখে বলে, আরে এসো হরি, ক'দিন দেখা নেই; আবার কি ধান্ধায় গেসলে নাকি!

হরিনারায়ণবাবু শুধোয়, মহাশ্বেতা নেই?

শেখর বলে, এখনও ফেরেনি। আজ পরীক্ষা শেষ হয়েছে, গেছে কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িত। ক'মাস খুবই খেটেছে।

—পরীক্ষা কেমন হলো?

হরিনারায়ণের কথায় শেখরবাবু বলে, এসে পড়বে। চা-টা খাও, দু'বাজি দাবা হোক, তারপর নিজেই শুধিয়ো। কাজের মেয়েটাকে তাড়া দেয়, কই রে, চা-টা দে! চিনি ছাড়া। হরি এসেছে।

দাবার লড়াইয়ের মাঝেই গাড়ি থামার শব্দটা পেয়ে চাইলেন হরিনারায়ণবাবু। জানলা দিয়ে দেখা যায়, বাইরে এসে গাড়িটা থেমেছে।

চঞ্চল গাড়িতেই বসে আছে।

মহাশ্বেতা বলে, বাড়ি যাবেন না?

চঞ্চল শুধায়, আজ টায়ার্ড লাগছে। বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে।

ওদের মনে কি খুশীর সুর।

চঞ্চল বলে, কাল বিকেলে বের হবে তো?

মহাশ্বেতা ঘাড় নাড়ে। আজ সেও মুক্তির স্বাদ পেতে চায়। আর দেখেছে চঞ্চলকে। সংযত ভদ্র ছেলেটিকে তারও এবার নতুন করে ভালো লাগে। ওকে ঠিক তখন চেনেনি। না চিনেই আঘাত করতে গেছল।

মহাশ্বেতা বলে, আর তো দুটো দিন ছুটি! তারপর আবার সেই অফিস।

চঞ্চল বলে, ভালোই হবে। তখন দেখা করার জন্য আমাকে আর ছুটতে হবে না। চলি—গুড নাইট।

বের হয়ে যায় চঞ্চল। হাসছে সে।

মহাশ্বেতাও হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

ব্যাপারটা দেখছেন হরিনারায়ণবাবু। গৌরের কথা মনে পড়ে। চঞ্চল ক'দিন মহাশ্বেতার পরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আজ ওদের চোখেমুখে দেখেছেন তিনি সহজ প্রীতির স্পর্শ।

চঞ্চল যে তার সেই গাম্ভীর্যটাকে ঝেড়ে ফেলে আজ সহজ হতে পেরেছে মহাশ্বেতার কাছে তাতে তিনিও খুশী হয়েছেন।

হঠাৎ হরিনারায়ণের খেয়াল হয় শেখরের ডাকে, কি হল হে! চাল দাও। ঘোড়া তো তোমার গেল!

খেয়াল হয় হরিনারায়ণের।

ততক্ষণে মহাশ্বেতা ঢুকেছে, কাকাবাবু!

শেখরবাবু বলে, কোথায় গেছলি? তোর পরীক্ষার খবর নিতে কখন থেকে এসে বসে আছে হরি।

হরিনারায়ণের কথার জবাবে বলে মহাশ্বেতা, ভালোই তো দিয়েছি। দেখা যাক কেমন রেজাল্ট হয়।

হরিনারায়ণবাবু বলে, ভালো হতেই হবে মা।

ক'মাস পর মহাশ্বেতা চাকরিতে জয়েন করে এবার কাজে ডুবে যায়। মিসেস ডিসুজাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

বলে সে, ক'মাস তুমি ছিলে না, দম ফেলার সময় পাইনি মহাশ্বেতা। এখন বাঁচলাম।

মহাশ্বেতা এখন দুই সাহেবকেই একা সামলায়।

জরুরী কাজ পড়লে হরিনারায়ণবাবু বলে, ক'দিন সকালেই বাড়িতে এসো। অফিসে লোকজন আসার কামাই নেই। কাজের ব্যাঘাতই হয়। বাড়িতে এলে ওখানে শান্তিতে কাজ করা যাবে। লাঞ্চের পর অফিসেই আসবো।

মহাশ্বেতা এই বড় বাড়িতে বিশেষ আসেনি। বাবা সুস্থ থাকাকালীন ছেলেবেলায় দু'একবার এসেছে। সে অনেক দিন আগে। তখন স্কুলে পড়তো সে।

হরিনারায়ণবাবুর নতুন এই প্রাসাদে সে আসছে প্রথমই। বিরাট বাড়ি। গেটে দারোয়ান। তারপর বেশ খানিকটা বাগান, ওদিকে

ফাঁকা বেশ বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। পেছনেও আম নারকেল আরও কিসব গাছের জটলা।

ড্রইংরুমে ঢুকতে যাবে, গৌরকে দেখে চাইল মহাশ্বেতা।

—দিদি, তুমি!

গৌরের মনে হয় চঞ্চলদার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে বোধ হয়। তাহলে জল বেশ দ্রুতই গড়াচ্ছে। গৌর বলে, বোস দিদি।

এমন সসয় হরিনারয়ণবাবুকে দেখে চাইল মহশ্বেতা। তিনি বলেন, এসে গেছো! জাস্ট ইন টাইম। এসো—

ওকে নিয়ে হরিনারায়ণবাবু ওদিকের অফিস ঘরে ঢুকে যান।

গৌর একটু হতাশই হয়। তাহলে যা ভেবেছিল তা নয়। কাজের জন্যই এসেছে এখানে মহাশ্বেতাদি।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, গৌর, তোর মাসিমাকে বলে দে—এই-খানেই মহাশ্বেতার জন্য চা খাবার পাঠাক।

মনেরমা চঞ্চলের বিয়ের চেষ্টা প্রথম দিকে বেশ তোড়জোড় করেই করেছিল। কিন্তু চঞ্চলের নানা ভাবে বিয়ের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে দেখে হতাশই হয়েছে। হাল ছেড়েই দিয়েছে এখন।

মা বলে চঞ্চলকে, তোর যা খুশি করগে যা!

চঞ্চল চা খাচ্ছিল। মনোরমাও রয়েছে। গৌর এসে জানায়, মাসীমা, প্রেসিডেণ্ট বললেন ড্রইংরুমে মহাশ্বেতাদি এসেছে। কি জরুরী কাজ আছে অফিসের। ওখানেই ব্রেকফাস্ট পাঠাতে বললেন। আর দুপুরেও এখানেই খাবে বোধ হয় মহাশ্বেতাদি। কাজে বসার তোড়জোড় দেখে তাই মনে হলো।

মনোরমা দেখছে চঞ্চলকে। মহাশ্বেতার নাম শুনে ও যেন একটু সচকিত হয়ে ওঠে। আর সেটা মায়ের নজর এড়ায় না। মনোরমাও মনে করতে পারে—মহাশ্বেতা, মানে ওর বন্ধু শেখরবাবুর মেয়ে।

গৌর বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব কাজের মেয়ে। ওই-ই মনে হয় সারা অফিসকে চালায়।

হঠাৎ একটি সুন্দরী মেয়েকে ঢুকতে দেখে চাইল মনোরমা। প্রসাধনের উগ্রতা নেই। শান্ত নম্র লক্ষ্মীশ্রী ওর মুখেচোখে চঞ্চলও অবাক হয়েছে।

মহাশ্বেতা এসে মনোরমাকে প্রণাম করে। চাইল মনোরমা। ঠিক

যেন চিনতে পারেনি। মহাশ্বেতা বলে, আমি মহাশ্বেতা কাকীকা!

মনোরমা অবাক হয়, ওমা! কত বড় হয়ে গেছো! তখন দেখেছি এইটুকু!

গৌর বলে, এবার ওকালতি পাস করবে!

মহাশ্বেতা বলে, পরীক্ষার রেজাল্ট আগে বের হোক। তারপর—

—ও হয়েই গেছো মহাশ্বেতাদিদি। তোমাকে কে আটকায়। তারপর এজলাসে চোর শয়তানদের ধরে ধরে ওদের মুখোস খুলে জেলে পোরো! মেয়েদের কতবড় হিম্মৎ দেখিয়ে দাও!

মনোরমা বলে, বোসো মা! মেয়েরাও সব পারে রে গৌর।

গৌর বলে তাইতো ভয়ে ওদের ত্রিসীমানায় যাই না! চঞ্চলদাকেও বলি ওসব ডেঞ্জারাস ব্যাপার, ধারেকাছে যেও না!

মনোরমা বলে, ঠাকুর, মহাশ্বেতাকে জলখাবার দাও!

নিজেই আনতে যাবে সে। মনোরমাই বাধা দেয়।

—আমিই নিচ্ছি কাকীমা!

চঞ্চল বের হয়ে যায় নীরবে, যেন মহাশ্বেতাকে তেমন চেনে না আর কথা বলার দরকারও নেই।

মহাশ্বেতা কয়েকঘণ্টার মধ্যেই জরুরী বাজেটের কপি, প্রোগ্রাম, এসবের ড্রাফট করে ফেলে। হরিনারায়ণবাবুও খুশী হন। বলেন, এই কাজ আমাদের সুপার সাত দিনেও শেষ করতে পারেনি। তুমি দেখছি চার ঘণ্টার মধ্যে করে ফেললে!

ওদিকে টাইপিস্ট টাইপ করে চলেছে।

মনোরমা এসে তাড়া দেয়, একটা বাজতে চললো—খাবে কখন! মেয়েটাকে তো দেখি দমভোর খাটাচ্ছো!

হরিনারায়ণবাবু বলেন, ওর কাছে এ খাটুনি কিছুই নয়। ক'ঘণ্টাতেই সব করে দিল। কি মনে হয় জানো মহাশ্বেতাকেই এবার এগ্‌জিকিউটিভ করে দেব!

মনোরমা শুনেছে ওর ল' পরীক্ষা দেবার কথা। মনোরমা বলে, কেন! তোমার চাকরি না করে ও বাপু আইন পাস করে অ্যাড-ভোকেট হবে। সত্যিকার বিচার যাতে পায় অসহায় মানুষ, তাই দেখবে। মেয়েদের হয়ে বিচার কেউ চাইতে যায় না। তাদের মুখ বুজে অন্যায় অত্যাচার সইতে হয়। ও তবু মেয়ে হয়ে তাদের জন্য

লড়বে।

হরি নারায়ণবাবু অবাক হন, বলছ কি তুমি! সব মেয়েরাই দেখছি মনে মনে এক একটি বিদ্রোহিনী। পুরুষাই তাদের উপর শুধু অত্যাচার করে, তেমন কোন নজীর দিতে পারো তুমি?

মনোরমা বলে হালকা স্বরে, কিছু নেই আপাততঃ।

—পরে ঘটতে পারে? হরিনারায়ণবাবু হাসতে থাকেন। বলেন, আর তখন আমাকেও ছাড়বে না?

মনোরমা বলে, নিশ্চয়ই। তাই বলে মহাশ্বেতা চাকরি নয়—ওই কাজই করবে। তবে তোমার অফিসে যদি আইনের কোন কাজ থাকে করতে পারে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, তোমার কাকীমার কথা শুনছো তো! ও তোমার বাবার মত আদর্শের কথাই বলে যে।

মনোরমা বলে, ঠিকই বলি। ঘরের হাঁড়িকুড়ি ঠেলার জন্য গোলামী করার জন্য এ যুগের মেয়েরা জন্মায়নি। তারা পুরুষের মত সব কাজই করতে পারে। লেখাপড়া তখন শিখিনি, এখন মনে হয় তোমাদের স্বার্থেই লেখাপড়া বেশী শেখাতে চাওনি।

মনোরমার কথায় হরিনারায়ণবাবু বলেন, তাহলে ডানহাতের ব্যবস্থা দেখছি বন্ধই হতো।

মনোরমা বলে, তা হবে না। চলো—

মহাশ্বেতা খাবার টেবিলে এসে নিজেই পরিবেশনের ভার নেয়। বলে, আগে কাকাবাবুর খাওয়া হোক। তারপর আপনার সঙ্গে খাবো।

মনোরমার সংসারে মেয়ে নেই। একটিমাত্র ছেলে ওই চঞ্চল। আর তার মতিগতির ঠিকানা বোঝে না। একটা মেয়েও নেই, তাই চেয়েছিল ঘরে বৌ আনতে। কিন্তু তাও হয়নি।

আজ মহাশ্বেতা মনোরমাকে পরিবেশন করে।

মনোরমা বলে, তুমিও বোস মা।

ভালো লাগে তার মহাশ্বেতাকে।

হরিনারায়ণবাবু এমনিতে বাড়িতে কথাবার্তা কমই বলেন। সংসারের সবকর্তৃত্বই মনোরমার হাতে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

মনোরমার হরিনারায়ণবাবুকে একান্তে পাবার সময় হয় রাত্রে ক'দিন ধরেই কথাটা ভাবছে মনোরমা মহাশ্বেতাকে দেখার পর তার মনে হয়েছে মেয়েটি সত্যিই ভালো। আর অফিসের কাজকর্ম'ও বোঝে। চঞ্চলের মত আপনভোলা প্রকৃতির ছেলেকে চালাবার জন্য এমনি একটি মেয়েরই দরকার। শান্ত অথচ কঠিন ধাতের মেয়ে মহাশ্বেতা।

হরিনারায়ণ স্ত্রীর কথায় সেদিন চাইলেন।

মনোরমা বলে, আমাদের তো টাকার দরকার নেই, একটি ভালো মেয়ের দরকার। যে ঘর-সংসার অফিস সবদিকেই নজর দিতে পারবে। শেখরবাবুর মেয়েটি কিন্তু ওসবই পারবে বলে মনে হয়। দ্যাখ না চঞ্চলের সঙ্গে যদি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

হরিনারায়ণবাবু কথাটা মনে মনে নিজেও ভাবেন। তাই আজ তাঁর স্ত্রীকেও কথাটা ভাবতে দেখে খুশীই হন। তবু বলেন তিনি, তোমার রাজপুত্রকে মত করাও। তাছাড়া মহাশ্বেতা ল' ফাইন্যাল দিয়েছে। রেজাল্ট বের হবে শীগ্গির। তারপর প্র্যাকটিস শুরু না করে কি বিয়ে করবে?

মনোরমা কি ভাবছে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, তাদেরও মতামতের প্রশ্ন আছে। জানো তো শেখরকে। আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু মনে মনে ও বড়লোকদের ঠিক মেনে নেয় না। সে কি তার মেয়েকে এখানে বিয়ে দিতে চাইবে!

মনোরমা বলে, এত সব জানি না। ভালো লেগেছে মেয়েটিকে তাই বললাম। এখন বাপ-বেটায় বোঝো তোমরা। তবে সাফ কথা বলে দিচ্ছি, বিয়ে-থা যদি না করে ছেলে, বলে দিও আমিও এ সংসারে ছুটি নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমেই চলে যাবো।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, কথাটা তোমার ছেলেকেও বোলো।

চঞ্চল ক্রমশঃ যেন নিজের সেই হারানো সত্তাকে ফিরে পাচ্ছে আবার। বিকেলে ছুটির দিন বের হয় মহাশ্বেতা আর সে। দুজনে ডায়মণ্ডহারবার না হয় অন্যদিকে কোথায় চলে যায়।

মহাশ্বেতা বলে, বড় ভয় করছে।

নদীর কিনারে গাংচিলের ডাক শোনা যায়।

চঞ্চল শুধোয়, কেন ?

—পরশুই তো রেজাল্ট বের হচ্ছে। কি হবে কে জানে !

চঞ্চলের হাতটা ওর হাতে। চঞ্চল বলে, ফাস্ট ক্লাস পাবেই।

মহাশ্বেতাও ভেবেছে কথাটা। বলে সে, লাভ কি ! চাকরিই করতে হবে হয়তো। আইন ব্যবসা করতে গেলেও চেম্বার লাগে হাইকোর্ট পাড়ায়। কোন নামী উকিলের জুনিয়ার হয়ে থাকতে হবে কয়েক বছর। তখন তো আমদানীও হবে না। ওদিকে সংসার তো চালাতে হবে। তাই মনে হয় ওসব পাস করেও কোন লাভই হবে না। লড়াই করার জন্যও রসদের দরকার হয়। তা তো নেই।

চঞ্চল কি ভাবছে। মহাশ্বেতার মনের ব্যথাটা যেন তার মনকেও স্পর্শ করেছে। আজ তার জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হতো চঞ্চল।

সন্ধ্যা নামছে। আকাশের আঙিনায় তারার চুমকি ফুটে ওঠে। ওরা ফিরছে শহরের দিকে।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। মহাশ্বেতা অধীর উৎকণ্ঠায় গেজেটে চোখ বুলিয়ে তার নামটা দেখে বের হয়ে আসে। ফাস্ট ক্লাস পেয়েছে মাত্র কয়েকজন, আর তার নামটা সেই লিস্টে বেশ উপরের দিকেই আছে।

হরিনারায়ণবাবু চেম্বারে কাজ করছেন, উত্তেজিত মহাশ্বেতাকে ঢুকে ঢিপ করে প্রণাম করতে দেখে চাইলেন।

মহাশ্বেতাই বলে, ফাস্ট ক্লাসই পেয়েছি কাকাবাবু।

—তাই নাকি ! সাবাস ! জানতাম তুমি ফাস্ট ক্লাসই পাবে। কনগ্রাচুলেসনস্ !

সারা অফিসেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই আসছে ওর কাছে।

চঞ্চল একফাঁকে এসে ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যায়।

বিকেলে দুজনে বের হয় আজ। চঞ্চল আর মহাশ্বেতা।

গৌরও জানে ব্যাপারটা। বলে সে, মহাশ্বেতাদি, মিস্টিটা কখন হবে ?

চঞ্চল বলে, এখন যা তো। ওসব পরে হবে।

বের হয়ে যায় তারা দুজনে। বলে চঞ্চল, কনভোকেশনে যাবে

কিন্তু।

মহাশ্বেতা বলে, কেন ?

—বাঃ রে! সবাই যায়। কবে হচ্ছে সেটা ?

মহাশ্বেতা বলে, জানা যাবে পরে।

আজ শেখরবাবুও চঞ্চলকে আসতে দেখে অবাক হল বেশ কিছু সেরা দোকানের সন্দেশও এনেছে। শেখরবাবু বলে, দ্যাখ মহাশ্বেতা, পাশ করলি তুই, মিষ্টি খাওয়াতে এলো চঞ্চল।

চঞ্চল বলে, সুখবর শুনে মিস্টিমুখ করাতে এলাম।

এসে পড়েন হরিনারায়ণবাবুও।

শেখর বলে, দ্যাখো হরি, চঞ্চল সুখবর শুনে কি সব এনেছে। তোমার তো আবার এ সব নিষেধ। তাহলে চা-ই খাও, চিনি ছাড়া।

মহাশ্বেতা বলে, মিষ্টিমুখ করতেই হবে কাকাবাবু, খানি কে. সি. দাসের দোকান থেকে 'ডায়াবেটিক সন্দেশ'ই এনেছি আপনার জন্য।

হরিনারায়ণ বলেন, তাহলে তো কথাই নেই।

শেখরবাবু বলে, চঞ্চল, তুমি বসে পড়ো। এগুলোর সদ্গতি তো করতে হবে।

চঞ্চল পরদিন বলে মহাশ্বেতাকে, কাল বেশ কাটলো!

মহাশ্বেতা শোনায়,তা কাটলো। কিন্তু কাকাবাবু তো তোমাকে ওখানে দেখে একটু অবাক হয়েছিলেন।

চঞ্চল এমনিতে কিছুটা বেপরোয়া। বলে সে, সো হোয়াট! তোমার পাসের খবর শুনে এসেছি। আর বাবা এমনিতে খুবই লিবারেল। ওসব নিয়ে কিছু ভাববেন না।

মহাশ্বেতাও সহজ হবার চেষ্টা করে। বলে সে, না ভাবলেই ভালো।

চঞ্চল শোনায়, বাবা না ভাবলেও মা বেশ ভাবিত হয়েছেন তোমাকে সেই দিন দেখার পর।

—কেন ?

—সেটা মাকেও শুধুতে পারো। না হয় মায়ের বিশ্বস্ত বাহন গৌরকেও। মায়ের মতিগতি, ভাবনাচিন্তার ব্যারোমিটার ওই গৌর-

চন্দ্রই। আমি নই।

হাসে মহাশ্বেতা, তুমি মায়ের অবাধ্য সন্তান তা বুঝেছি।

—তাই নাকি !

চঞ্চলের কথায় মহাশ্বেতা বলে, কাকীমা এমনিতে সত্যিই খুব ভালো। মাকে মনে পড়ে না—ওকে দেখে মা বলেই মনে হয়

চঞ্চল বলে, লক্ষণ সুবিধার বুঝছিনা

—কেন ? মহাশ্বেতা কি বলার চেষ্টা করে।

চঞ্চল জানায়, সব কথার উত্তর হয় না মশাই। ওই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বলে, কাল কনভোকেশন। যেতে হবে। মনে আছে তো ? এত খেটে ডিগ্রীটা পেলে সেটা আনতে যাবে না ?

মহাশ্বেতা বলে, ওই সব ধড়াচূড়া পরে ?

চঞ্চল বলে, যে পুজোর যে মন্ত্র। তাছাড়া ধড়াচূড়া পরার কাজই বেছে নিতে চাও, পারবে না ?

মহাশ্বেতা শোনায়, ওকালতি করা আর হবে কি করে ? বলিনি আগে লড়াই করতে গেলে রসদ চাই। ওসব তো নেই।

তবু পরদিন চঞ্চল ওকে ছাড়বেনা। জোর করেই কনভোকেশনে নিয়ে যায়। কলেজ স্ট্রীটের কোন দোকান থেকে গাউন, হুড, ক্যাপ এসব ভাড়া করে মহাশ্বেতাকে পরতে বাধ্য করায়। মহাশ্বেতা বলে, উঁহু, লজ্জা করছে।

চঞ্চল ধমকে ওঠে, তোমাকে কেউ বিয়ের কনে সেজে পিঁড়িতে বসতে বলছে না বাপু। কনভোকেশনে যেতে বলছে। কত ছেলে-মেয়ে যাবে দেখে নিও। চলো তো—

মহাশ্বেতাকে নিয়ে গেছে চঞ্চল জোর করে কনভোকেশনে। অনুষ্ঠান, ভাষণ এসব শেষ হবার পর ডিগ্রী নিয়ে ওরা উঠেছে গাড়িতে।

মহাশ্বেতা বলে, সাজা রাজার পালা এবার শেষ। কিন্তু গাড়ি-টাকে বিবাদীবাগের দিকে যেতে দেখে বলে মহাশ্বেতা, কোথায় বলেছি !

বলে চঞ্চল, চলোই না। ভয় নেই।

গাড়িটা বিবাদীবাগ ছাড়িয়ে হাইকোর্ট পাড়ার এদিকে এসে

থামলো। এখানে শুধু উকিল, অ্যাটর্নী মুহুরী মক্কেলদের ভিড়। বড় বড় বাড়িগুলোর খোপে খোপে ওই আইনজীবীদের অফিস—যেন মৌচাকে মৌমাছিরা ভন্‌ভন্‌ করছে। রাস্তায় গাড়ির জাম। মক্কেলের দল এদিক ওদিকে কোন মুহুরীর পিছনে ছোটাছুটি করছে।

চঞ্চল গাড়িটা পার্ক করে ওদিকের একটা বিলডিংএ ঢুকলো মহাশ্বেতাকে নিয়ে। বিকেলের দিক। হাইকোর্ট, অন্যকোর্টএর ভাঙার পালা। ভিড় তবু কিছুটা কম।

বাড়িটার চারতলায় লিফটে উঠে আসে তারা। মহাশ্বেতা অবাক হয়, কোথায় চলেছি!

চঞ্চল হাসে, এসো না, ওইতো সামনেই একটা নতুন অফিস ঘর। বাইরে পিতলের প্লেটে নাম লেখা মহাশ্বেতা সেন। এম-এ, এল এলবি। অ্যাডভোকেট।

চমকে ওঠে মহাশ্বেতা। দেখছে তারই নাম—অফিস! চোখে-মুখে ওর বিস্ময়। দেখছে সে চঞ্চলকে। যেন বিশ্বাসই করতে পারে না ব্যাপারটা।

এমন সময় ভিতর থেকে এসে উদয় হয় ভজহরিবাবু। তার বাবার পুরনো চালু মুহুরী। বয়স হয়েছে তবু ভজহরির স্বাস্থ্য বেশ টাইট মুগুরের মত। মাথার টাকটা ঈষৎ বেড়েছে মাত্র। ভজহরিই বলে, আসুন ম্যাডাম! আসুন—

অবাক হয় মহাশ্বেতা, আপনি!

ভজহরি বলে, ছোট সাহেব খবর পাঠালো—আর শুনলাম আপনি এবার ওথ নিয়ে এখানেই প্র্যাকটিস করবেন। হাজার হোক পুরানো ঘর, আমার মনিবের মেয়ে। দু'পুরুষের উকিল। না এসে পারলাম না। নবনীবাবু, শিয়ালদহ কোর্টের বিক্রমশালী লয়ার, ওকেই জবাব দিয়ে চলে এলাম।

ভজহরি এক নিমেষে এজলাসে দাঁড়িয়ে তালিম দেওয়া সাক্ষীর মত গড়গড় করে সব বলে গেল।

চঞ্চলের সঙ্গে মহাশ্বেতা অফিসেও ঢোকে। বাইরে মক্কেলদের বসার জায়গা, ওদিকে টাইপরাইটার মেসিন, টাইপিস্টও হাজির, এদিকে ভজহরির সেরেস্তা, আর ওদিকে সুইং ডোরের ওপারে মহাশ্বেতার নিজের চেম্বার। নতুন চেয়ার টেবিল। সবই হাজির।

চঞ্চল বলে, ফোনও এসে যাবে। এবার উদ্বোধন হয়ে যাক। যাও, চেয়ারে বসো।

মহাশ্বেতা দেখছে চঞ্চলকে। চঞ্চল বলে, এবার এখানেই বসবে। অফিসে নয়। কাল বড় সাহেব একবার দেখা করতে বলেছেন তোমাকে। সেখানেই সব শুনবে।

মহাশ্বেতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে ওই চঞ্চলের জন্যই। কেনদিন ভাবতেও পারেনি মহাশ্বেতা যে এতবড় সুযোগ সে পাবে এই এলাকায় এমনি অফিস পাবার ভাগ্য তার হবে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে গঙ্গার বুকে। ওরা দুজনে এসে বসেছে কোর্টের পিছনে গঙ্গার ধারে। মহাশ্বেতা বলে, ভাড়া, এসব কি দিতে হবে? কত খরচ টরচ?

চঞ্চল বলে, বাড়িটা চৌধুরী কনসার্নের। একটা সুট খালিই ছিল, সেটাকে কাজে লাগানো হলো। আর ভাড়া যদি দিতেই চাও, কাল বড় সাহেবকে বলো—পঞ্চাশ টাকাই দেবে মাসে—অ্যাজ এ টোকেন রেন্ট।

মহাশ্বেতা খুশীতে যেন ডগমগ।

চঞ্চল বলে, কিন্তু কথাটা মনে আছে তো! না, পাস করে গায়ে শ্যামলা চাপিয়ে এজলাসে দাঁড়িয়েই সব ভুলে যাবে।

—মানে!

চঞ্চল বলে, গরীব, নিপীড়িত যারা আইনের বিচার পায়নি তাদের সেই বিচার পাইয়ে দিতে হবে।

মহাশ্বেতা চঞ্চলের হাতটা ধরে বলে, মনে আছে মশাই। মনে থাকবে।

—গুড! চঞ্চল গম্ভীর ভাবে বলে।

হেসে ওঠে মহাশ্বেতা।

শেখরবাবুই খুশী হন সব থেকে বেশী।

চঞ্চল মহাশ্বেতা ফিরেছে বাড়িতে। মহাশ্বেতা কনভোকেশনের পোশাকেই প্রণাম করে বাবাকে।

শেখরবাবু বলে সব শুনে, বলিনি মা! ইচ্ছা থাকলেই পথ হয়। তুই একদিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবি। মস্তবড় সমাজসেবী

অ্যাডভোকেট হবি মা। আর চঞ্চল! কি বলে যে তোমাকে আশীর্বাদ করবো বাবা—

চঞ্চল বলে, আমি নিমিত্তমাত্র কাকাবাবু। যা বলার আপনার বন্ধুকেই বলবেন। বাবাই সব ব্যবস্থা করেছেন।

শেখরবাবু বলে, হরিটা এতবড় ধাপ্পাবাজ, একবার জানায়ওনি আমাকে। এসে দাবার চালে গোহারান হেরেছে আর তলে তলে এই সব করেছে। আসুক সে আজ! এই যে।

হরিনারায়ণও এই সময় এসে পড়েন। বলেন তিনি, ব্যবসাদার লোক হে আমি, বিনা স্বার্থে কিছু করি না। এখন ব্যবসা করতে গিয়ে দেখছি পদে পদে কোর্টকাছারির দরকার। আর আমার ল অফিসার নীরেন—নীরেনবাবু অ্যাডভোকেট একা হালে পানিপাচ্ছে না। তাই মহাশ্বেতাকেও ল অ্যাডভাইসার রাখতে হবে ওখানে। ও নিজের প্রাকটিসও করবে, আমাদের কেসগুলোও দেখভাল করবে। লড়বে।

ভজহরি ধুরন্ধর ব্যক্তি। সে বলে, ভালোই হবে ম্যাডাম। দেখবেন কেসের আমদানী কি লাগিয়ে দিই।

শেখরবাবু ধমকে ওঠে, তোমার শোষণটা একটু কম করো ভজ-হরি। গরীবের ওপর বড় জুলুম করো তুমি।

ভজহরি লজ্জায় জিব বের করে বলে, টাকা হাত বোলাতে বোলাত, কি যে বলেন স্যার! ছিঃ, ছিঃ!

মনোরমার কাছেই গেছে সেদিন মহাশ্বেতা। মহিলাটিকে তার ভালো লাগে। সংসারের স্নেহময়ী কর্ত্রীই নন। মেয়েদের জন্য তিনিও ভাবেন।

মহাশ্বেতাকে আসতে দেখে বলে মনোরমা, এসো মা, খুব খুশী হয়েছি তোমার উকিল হবার কথা শুনে।

গৌরও সঙ্গেই আছে। বলে সে, দেখবে এবার দিদির দাপট। এজলাসে এই হাঁকানি ছাড়বে!

মনোরমা বলে, গরীবদের জন্যে অসহায় মেয়েদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করো মা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

ভজহরি এর মধ্যে খবরটা চাউর করেছে আর সহজেই আইনের সাহায্য পাবে এটা জেনেই এসেছে অনেক গরীব মক্কেল। অবশ্য

ভজহরি বাইরে তার অপারেশন চালু করেছে গোপনে।

তবু মক্কেলরা তাও দেয়। কারণ এর মধ্যেই মহাশ্বেতা দু'তিনটে কেশ বেশ দারুণভাবে সাজিয়েছে বাবার পরামর্শ মত। শেখরবাবু বাড়িতে বসেই ব্রিফগুলো পড়ে। ল পয়েণ্টও বাতলে দেয়। মহাশ্বেতাও তার মত করে দু'তিনটে পয়েণ্ট বেছে নিয়ে তার ওপর কেসটা সাজায়। আর এর মধ্যে মহাশ্বেতা যেন নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বও অর্জন করেছে। আদালতে বিচারকের সামনে শ্যামলা চাপিয়ে যেন মনের অতলে একটা জোর পায় সে। কণ্ঠস্বর, চলাফেরাই বদলে যায়। এ যেন অন্য মানুষ

সেদিন কোন বরখাস্ত করা শ্রমিকের কেস নিয়ে আদালতে হৈ চৈ পড়ে যায়। তাকে মিথ্যে চুরির কেসে জড়িয়ে বরখাস্ত করা হয়েছিল। মহাশ্বেতা সেই কেসের দারোগাবাবুকে জেরার চালে বেকায়দায় ফেলেছে যে বেচারী যে বিশেষ কারণে এই ডাইরী নিয়েছিল তাও প্রকাশ করে আদালতে। আর মালিককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আরও দুজন সাক্ষীর বয়ান মত জেরা করে প্রমাণ করে যে লোভী মালিকের মোটা টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার ব্যাপারে ওই ভদ্রলোক বাধা দিয়েছিল তাই এইভাবে ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে।

কাগজেও বের হতে থাকে এই কেসের বিবরণ। আদালতে মহাশ্বেতার তীক্ষ্ণ জেরার খবর। কর্মচারীটিকে তিন বৎসরের বকেয়া পুরো মাইনে মিটিয়ে দিয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল করার আদেশ দেন বিচারক।

শেখরবাবু কেসটার খবর শুনে বলে, তুই জিতবি তা জানতাম মা।

সেই অসহায় কর্মচারীটিও এসেছে তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

আজ মহাশ্বেতার মনে হয় অনেক পেয়েছে সে। আর এই পাওয়ার জন্য সে ঋণী চঞ্চলের কাছে।

চঞ্চল অফিসের পর বিকেলে আসে মহাশ্বেতার অফিসে। মহাশ্বেতা তখন মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত। টাইপরাইটারের শব্দ ওঠে।

ভজহরিকে কি সব নির্দেশ দেয় মহাশ্বেতা। কালকের কেসগুলোর সম্বন্ধে কিছু নোট দিয়ে যখন বের হয় তখন সন্ধ্যার স্তব্ধতা নেমেছে হাইকোর্ট পাড়ায়।

মহাশ্বেতা বলে, আজ তোমার জন্যই এসব চঞ্চল।

চাঁদনী রাত। গাড়ি রেখে গঙ্গার ধারে বসে তারা।

চঞ্চল বলে, জীবনে মানুষ কিছু দিতে,কিছু পেতে চায় শ্বেতা। এতদিন ধরে কথাটা ভাবিনি। কিন্তু মনে হয় এবার ভাবার সময়ও এসেছে।

মহাশ্বেতা দেখছে ওকে। মহাশ্বেতার জীবনে অনেক বড় সংগ্রামের পর এখন যেন একটা পথের সন্ধান পেয়েছে সে। তার নারীমনও আজ কিছু পেয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। মহাশ্বেতা বলে, আমিও কথাটা ভাবি চঞ্চল, তোমার শূন্যতার ব্যাথা তো বুঝি।

চঞ্চলের কাছে এই শূন্যতাটা যেন দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই কি যেন বলতে চায় সে। মহাশ্বেতাকে দেখছে এতদিন ধরে। ক্রমশঃ কাছে এসে আজ তার মন কি যেন জানাতে চায়।

চঞ্চল বলে, তাই যদি তোমার আপত্তি না থাকে আমাদের ঘর বাঁধতে দোষ কি? আজ আর গরীব বড়লোকের প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেউ কারো অবলম্বন, নির্ভরের প্রশ্নও নেই। দুজনে কি তাহলে সহজভাবে বাঁচতে পারি না একসঙ্গে, একই ঘরে?

জোয়ার-ভরা রাতের গাং। বাতাসে ঢেউয়ের শব্দ। কোথায় এর মাঝে রাতজাগা পাখি ডাকে। ঘুমন্ত শহর। দু-একটা গাড়ি যেন উন্মাদের মত ছুটে চলেছে।

—মহাশ্বেতা!

চঞ্চল ওর হাতখানা তুলে নেয়। কি ভাবছে মহাশ্বেতা। তার সারা মনে কি আশা-নিরাশার দোলা। তার মনের অতলে জাগে এমনি আত্মনিবেদনের সুর। নারীজীবনের সার্থকতার স্বপ্ন।

বলে মহাশ্বেতা, একটু ভাবতে দাও চঞ্চল। হঠাৎ এমন ঝড়ের মধ্যে ফেলেছ—

হাসে চঞ্চল, বেশ তো, তোমাকে জোর করবো না। তুমি ভেবে দেখ। মনে হয় ভুল কিছু বলিনি আমি।

গৌর এখন মনোরমার বাহনই।

মনোরমা বলে, তোর চঞ্চলদার খবর কি রে?

গৌর যা জানে তাতে মনে হয় চঞ্চলদা একটু বেশীই মেলামেশা করছে মহাশ্বেতাদির সঙ্গে। দুজনকে একসঙ্গে এখানে ওখানেও দেখেছে গৌর। অবশ্য নিজে সে অদেখা রয়ে গেছে। তাই মাসীমার কথায় বলে, একটু ধৈর্য ধরে থাকো মাসী। গৌরের ওপর ভার দিয়েছো দেখ না গৌরের এলেম।

আর এর ক'দিন পরই কোন রবিবার ছুটির দিন মহাশ্বেতা ও চঞ্চল বের হয়েছিল ব্যান্ডেল চার্চের দিকে। সেখানেই কোন সবুজ নির্জনে আজ মহাশ্বেতা জানায় তার সম্মতির কথা।

চঞ্চল জড়িয়ে ধরে ওকে! চমকে ওঠে মহাশ্বেতা ওই নিবিড় স্পর্শে—অ্যাই!

চঞ্চল বলে এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। এতবড় খবরে খুশীর চোটে একটু যেন বেড়ে গেছলাম! আজ নিশ্চিন্ত। মাও খুব খুশী হবেন। আর গৌরটাও।

মহাশ্বেতা চাইল, গৌর!

—মায়ের বাহন। মা তো তার ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য রেডি হয়ে আছে। খবরটা শুনতে পেলে হয়! অমনি প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে।

সকালেই সেদিন চায়ের টেবিলে চঞ্চল কথাটা জানায় বাড়িতে। মনোরমা দেখছে ছেলেকে।—সত্যি বলছিস তুই!

চঞ্চল মায়ের কথায় হাসল মাত্র।

গৌর বলে, বলিনি মাসীমা, গৌর যখন কেস টেক আপ করেছে তখন একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে।

মনোরমা বলে, খুশি তো বাবা। বাবা-মায়ের সখ সাধ তো আছে চঞ্চল।

চঞ্চল বলে, গৌর, এবার তোর পালা।

—মানে! গৌর চমকে ওঠে।

চঞ্চল বলে, মাসীমায়েরও একমাত্র ছেলে তুই। মাসীমায়ের সখ-সাধ তো আছে।

—নো। গৌর তেড়েফুঁড়ে ওঠে—ওসবে আমি নাই চঞ্চলদা। তুমি সাহসী আছো লড়ে যাও। আমার ঘাড়ে কেন? ওরে বাবাঃ!

মনোরমা বলে, এখন এই শুভ কাজটা তো উম্ধার কর। তারপর ভাবা যাবে তোকে ছেড়ে দেব কি না

গৌর বলে, জান লড়িয়ে এই শুভ কাজ তুলে দেব। আমাকে ফাঁসিয়ো না মাসিমা প্লিজ!

হরিনারায়ণবাবুর অবশ্য অংকটা মিলে যাচ্ছে মাত্র। তিনি তো চেয়েছিলেন এমনি কিছু ঘটুক আর অনুমানও করেছিলেন। তাই সহজ ভাবেই মেনে নেন ব্যাপারটা

কিন্তু খুশীতে ফেটে পড়ে শেখরবাবু।

—বল কি হরি! মহাশ্বেতাকে তুমি বৌ করে ঘরে নেবে।

হরিনারায়ণ বলেন, বলিনি, ব্যবসাদার আমি। দাদন দিয়ে পরের জিনিস নিজের ঘরে তুলি। মহাশ্বেতা শুধু বৌমাই হবে না হে, চৌধুরী কনসার্নকে বাঁচাতে গেলে ওকেই কর্ণধার হতে হবে। স্বার্থ তো আমারই।

শেখর বলে, তোমার কাছে আমার ঋণ এ জ বনে শোধ হবে না ভাই।

—তাই তো ক্রোক করে তোমার ঘর থেকে সবচেয়ে দামী জিনিসই নিলাম। যাকগে—শোন, বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য চঞ্চলের মা তো উঠেপড়ে লেগেছে। বাড়িতে পাঁজিপুঁথি নিয়ে পণ্ডিতের আমদানীও হয়েছে। শুনলাম আগামী মাসের বারোই দিন ধার্য হয়েছে।

—বারোই! আর ক'টা দিন মাত্র! শেখরবাবু বলে, আমারও তো আয়োজন করতে হবে'

হরিনারায়ণ বলেন,গৌরকে পাঠিয়ে দেব। তবে তুমি আবার হৈচৈ বেশী করো না। শরীর খারাপ—অনুষ্ঠান যা করার ও বাড়িতেই করবো।

মনোরমার ঘুম কোন্ দিকে চলে গেছে। সামনে এতবড় কাজ। বাজার করা, নেমন্তন্ন করা—সব অনুষ্ঠান বৌভাত হবে প্রধানতঃ বাঙালী মতে এই বাড়িতে।

হরিনারায়ণ বলেন, কিন্তু বিজনেস সার্কেল, বোম্বাই-দিল্লীর

বন্ধুরা আসবেন, এখানেও সোসাইটিতে পার্টি দিতে হবে।

মনোরমা বলে, তোমার ওই ইয়ে-টিয়ের পার্টি, ওই সব অখাদ্য-কুখাদ্যর ব্যাপার হোটেলেই সারবে বাপু। ও পার্টি হোটেলে দেবে। এখানের ব্যবস্থা আলাদা হবে। তুমি ডেকরেটার, ক্যাটারারদের খবর দাও।

বাড়িতে যেন যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হতে চলেছে।

মহাশ্বেতা অবশ্য যথারীতি কোর্টে বের হচ্ছে,চেম্বারেও বসছে। তার সামনে মামলাগুলো এখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কোন বধূ নির্যাতনের কেস নিয়ে মহাশ্বেতার সওয়াল কাগজের শিরোনামে পরিণত হয়েছে।

চঞ্চল আসে অফিসের পর। মহাশ্বেতাও যেন তার পথ চেয়ে থাকে। দিনের শেষে সন্ধ্যার তারা-জ্বলা অন্ধকারে ওরা দুজনে এখন দুজনের জন্য কিছু নিভৃত অবকাশই বের করেছে। দুজনে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে।

মুহুরি ভজহরি অবশ্য তার কাজ ঠিকই চালাচ্ছে। সেদিন অফিসে এক বৃদ্ধ অবাঙালী ভদ্রলোককে একটি মেয়ে আর বাচচা ছেলেকে নিয়ে ঢুকতে দেখে ভজহরি চাইল।

ভদ্রলোক ভাঙা ইংরাজীতে বলে, আমি মহাশ্বেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভজহরি ঈষৎ মোচড় মারার জন্যই বলে, তিনি এখন বিজি। দেখা হবে না।

ভদ্রমহিলা বলে, বহুদূর থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছি। খুবই বিপদ আমার দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

ভজহরি বুঝেছে কেস গড়বড়। তাই শুধোয়, কি কেস ?

এমন সময় কোর্ট থেকে ফিরছে মহাশ্বেতা। ওদের দেখে দাঁড়ালো সে।

ছোট্ট ছেলেটির ডাগর দু'চোখে নিষ্পাপ পবিত্রতা।

সে এগিয়ে আসে মহাশ্বেতার দিকে। মহাশ্বেতা কাছে টেনে নেয় তাকে, কি নাম তোমার ?

ছেলেটি দেখছে ওকে। জবাব দেয় মেয়েটিই ইংরাজীতে, ওর নাম নচিকেতা, বাংলা ও জানে না। আমরা দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা।

—এখানে ?

বৃদ্ধ বলে, তোমার নাম শুনে তোমার কাছেই এসেছি মা। বড় অসহায় আমি। ওই আমার মেয়ে। আজ ওর আর ওর ওই ছেলের জন্যই বই বৃদ্ধ বয়সে এতদূর থেকে ছুটে এসেছি মা।

ভজহরি বেগতিক বুঝে বলে, এখন ওকে রেস্ট নিতে দিন সবে এজলাস থেকে ফিরেছে !

মহাশ্বেতা ওর কথায় কান না দিয়ে বলে বৃদ্ধকে. ভিতরে আসুন আপনারা। গোবিন্দ একটু কফি বিস্কিট দাও ! আর এর জন্য কিছু সন্দেশ আনো। চলো নচিকেতা—

ছেলেটার হাত ধরে মহাশ্বেতা ওদের তার চেম্বারে নিয়ে যায়।

হতাশ হয়ে ভজহরি মন্তব্য করে, এনাদের জালি কেস।

মহাশ্বেতা একটি অসহায় মেয়ের করুণ কাহিনীই শুনছে: ওই মেয়েটিকে কলকাতার কোন এক ধনীর দুলাল ভালোবেসে বিয়ে-থা করেছিল আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। কয়েক দিনেই তার সেই নেশা ছুটে যায়। ওই মেয়েটিকে ছেলেটি পরিত্যাগ করে মিথ্যে একটা দোষ দেখিয়ে।

বৃদ্ধ বলে, আমারও মান-সম্মান আছে মা। মেয়েকে নিয়ে চলে আসি। কোন দাবী বা ভিক্ষা কিছুই করিনি মেয়ের জন্য। কিন্তু সেই মেয়ে সেই ছেলেটির সন্তানের মা হতে আমিও বুঝতে পারি মেয়ের জন্য নয়, ওই অসহায় সন্তানের জন্য সমাজে পরিচয় চায়, ঠাঁই চায়। না হলে ওই অবোধ সন্তান সমাজে মুখ দেখাবে কি করে। আমারও সামর্থ্য নেই। তাই এসেছি তোমার কাছে মা—ওই সন্তান আর এই মায়ের জন্য। ওদের জন্য তুমিই কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে। শুনেছি অসহায় গরীবদের কথা তুমি ভাবো। অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছ।

মহাশ্বেতা দেখছে ওদের। শান্ত নম্র মেয়েটির চোখে জল নামে। অপমানিতা, পরিত্যক্তা মেয়েটির পাশে আজ কেউ নেই।

বৃদ্ধ বলে, শুনেছি তারা খুব বড়লোক নামী পরিবার।

মহাশ্বেতা বলে, আইনের আশ্রয় নেবার আগে অন্ততঃ আপনারা একবার তাদের বাড়িতে যান। তাদের বুঝিয়ে বলুন। বড়লোক, নামী পরিবার, হয়তো সম্মানের ভয়েই একটা মীমাংসা করতে চাই-

বেন। সম্মানজনক শর্ত যদি হয় তাহলে মীমাংসা করে নেবেন। হয়তো তারা তাদের বৌ-নাতিকে বঞ্চিত করবেন না। এর আগে তো যাননি ওখানে?

বৃদ্ধ বলে, না মা। এই প্রথম কলকাতা এসেছি। দক্ষিণের দেশ-প্রিয় পার্কের ওখানে একটা হোটেলে উঠেই তোমার এখানে এসেছি। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো কাল সকালেই যাবো তাদের বাড়ি। দেখি তাঁরা কি বলেন।

বের হয়ে যায় ওরা।

মহাশ্বেতা কফি শেষ করে নিজের কাজে মন দেয়। কালকের একটা কেসের শুনানীর ল পয়েণ্ট নোট করতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

—এখনও কাজ করছো! ঢুকছে চঞ্চল।

মহাশ্বেতা বলে, হয়ে গেছে। বসো—চা খাবে?

চঞ্চল বলে, কাজ সেরে নাও। বাইরে গিয়ে খাবো।

মহাশ্বেতা তার কেসের ব্যাপারেও কথা বলে। কোন একজন সরকারী অফিসার কনট্রাকট্যরের তিন লাখ টাকা কিভাবে চোট করে-ছেন তাই শোনাতে থাকে। বলে আজ আসা সেই মেয়েটির কথা।

বড়লোকের ছেলে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বাচ্চাকেও দেখে না।

চঞ্চল বলে, ওই শয়তানদের ধরে ধরে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। বিয়ে করে ছেলে বৌকে দেখবে না?

খেয়াল হয় চঞ্চলের। শোনো, বিয়ের আংটিটা কিনতে হবে।

মহাশ্বেতা বলে, হবে একদিন।

চঞ্চল বলে ওঠে, মাকে জানো না। মা যা তাড়া লাগাচ্ছে। যেন আংটি এখুনি না হলে বিয়ে হবে না।

মহাশ্বেতা বলে, ওঁকে বলো, হবে ওসব।

মনোরমা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

বাড়িতে ওদিকের মাঠে ডেকরেটারের লোকজন ট্রাক থেকে বাঁশ নামিয়ে মাপজোক করছে। প্যাণ্ডেল করতে হবে বেশ খরচা আর যত্ন করে। গৌর ওখানে ওদের লোকদের কাজ বোঝাতে ব্যস্ত।

এমন সময় ট্যাক্সিটাকে এসে গাড়িবারান্দায় থামতে দেখে চাইল। হবে কেউ—এখন প্রেসের লোকদের আসার কথা। কার্ড ছাপাতে হবে মনোরমার পছন্দমত।

ড্রইংরুমে প্রেসের লোক, ডেকরেটারের ম্যানেজার বসে—ওরাও ঢুকলো। একদিকে ওই বৃদ্ধ আর মেয়েটি বসেছে। এই দামী ফার্নিচারে, কার্পেটের ওপর তারা যেন বেমানান। ছোট্ট ছেলেটা দেখছে অবাক হয়ে সবকিছু। ওর পোশাকও তেমন দামী মোটেই নয়। এই বিত্তবানদের পরিবেশে ওরা গোত্রহীন বলেই মনে হয়।

মনোরমা জানে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছে লোকজন। হরিনারায়ণ-বাবুকে বলে, চলো।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, আমি যাবো? তোমার ব্যাপার—

ওরা দুজনে ঢুকতে ওই অনুগৃহীতের দল উঠে দাঁড়ায়। ওই বৃদ্ধ দেখছে ওদের। বাচ্চাটা খেলতে খেলতে এগিয়ে গেছে ওদিকে। মনোরমা ঢুকতে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। ওই মুখ, ডাগর চোখ, ওর কণ্ঠস্বর সব যেন খুব চেনা! দাঁড়াবার ভঙ্গীটাও।

—নাম কি তোমার?

ছেলেটা খুবই বুদ্ধিমান। কালই নাম কথাটা শুনেছে। বলে সে, নেম! মাই নেম ইজ নচিকেতা—

—নচিকেতা! বা, সুন্দর নাম। মনোরমা আদর করে ছেলেটিকে।

হঠাৎ মেয়েটি দেখে এগিয়ে আসে, শান্ত নম্র চেহারা, যেন বিষণ্ণতার মূর্তি। সুন্দরীই বলা যায়। তবে সেই সৌন্দর্যে কোন উগ্রতা নেই। মেয়েটি ধরে ছেলেটিকে। ভাঙা হিন্দীতে বলে, খুব দুষ্টু। তোমাকে বিরক্ত করছিল?

মনোরমা বলে, না না, খুব ভালো ছেলে। আমার ছেলেও ছোট-বেলায় দেখতে ঠিক এমনিই ছিল। একেবারে সেই মুখ চোখ।

বৃদ্ধ এবার বলে, তাই তো এসেছি মা। একটা কথা ছিল।

হরিনারায়ণবাবু চাইলেন, কি বলতে চান?

বৃদ্ধ বলে, এই আমার মেয়ে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আপনার ছেলে বোম্বাইয়ে থাকার সময় আমার এই একমাত্র মেয়ে জয়লক্ষ্মীকে বিয়ে করেছিল।

হরিনারায়ণবাবুর মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। বলেন তিনি, ইম্‌পসিবল! এসব মিথ্যা কথা!

বৃদ্ধ বলে, না। আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরের নামে ধর্ম-সাক্ষী করে বলছি ওই তার ধর্মপত্নী। ওই সন্তান তখন ওর গর্ভে, সেই সময় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ওকে পরিত্যাগ করেছিল। আজ ওই সন্তানের কি দোষ? কেন ও পিতৃপরিচয় পাবে না? সব থাকতে ও কেন নাম-পরিচয়হীন জারজ সন্তানের মত পথে পথে অনাহারে মুখ লুকিয়ে ফিরবে? স্বামীর এত বৈভব থাকতে তার স্ত্রী কেন সন্তানের সঙ্গে বাঁচতে পাবে না। তাই এসেছি আপনার বৌমা, আপনার বংশধর ওই ছেলেকে পৌঁছে দিতে।

মনোরমা অবাক হয়ে শুনছে ওই কাহিনী।

তার মনে হয় হয়তো সত্যিই এই কাহিনী। বোম্বাই থেকে চঞ্চল ফিরেছিল কি এক আঘাত নিয়ে। আজ ওই ছেলেটিকে দেখে প্রথমে তাই চমকে উঠেছিল মনোরমা। অবিকল শিশু চঞ্চলকে দেখছিল সে।

হরিনারায়ণবাবুর সম্মানে আজ কালি ছেটাতে এসেছে তারা। তাঁর বংশে এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। এখুনি চারদিকে হৈচৈ পড়ে যাবে। হরিনারায়ণবাবু বলেন, এসব মিথ্যে কাহিনী। কোথা থেকে কে আপনাদের আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পাঠিয়েছে। এসব মিথ্যে।

চঞ্চল নামছিল হঠাৎ ড্রইংরুমে ওকে দেখে বৃদ্ধ এগিয়ে আসে। মেয়েটিও দেখছে তাকে।

চঞ্চল শুনেছে বাবার কণ্ঠস্বর। আজ চঞ্চল ওই সব পরিচয় এড়িয়ে যেতে চায়। সে আগেই মনস্থির করে ফেলেছে।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, চেন? চেন ওদের? ওই ভদ্রলোক, ওই মেয়েটিকে?

লক্ষ্মী দেখছে ওকে ব্যাকুল চাহনি মেলে।

বৃদ্ধ বলে, বলো চঞ্চল?

চঞ্চল বলে ওঠে, আপনাদের কাউকেই চিনি না। কে আপনারা? হঠাৎ আমার এখানেই বা কেন এসেছেন?

বৃদ্ধ চমকে ওঠে, চঞ্চল! লক্ষ্মী—জয়লক্ষ্মীকে তুমি চেন না?

—না!

হরিনারায়ণবাবু এবার গর্জে ওঠেন, আপনারা যাবেন, না ব্ল্যাক-

মেল করার অপরাধে জেলে যাবেন ? বেশ পেশা নিয়েছেন ! মেয়েকে নিয়ে বড়লোকের বাড়ি চড়াও হয়ে স্ত্রী সাজাতে চান ?

বৃদ্ধ চমকে ওঠে, কি বলছেন ? না না !

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সারা শরীর রাগে, অপমানে কাঁপছে। মেয়েটি ধরে তাকে, বাবা, চলো এখান থেকে। অনেক হয়েছে, আর না।

মনোরমা দেখছে ছোট্ট ছেলেটিকে। তার চোখের সামনে একটা অন্য ছবি যেন ফুটে ওঠে।

গৌর ওদিকে ব্যস্ত ছিল। ড্রইংরুমের দিকে আসতে গিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে কাদের বের হয়ে যেতে চাইল। চমকে ওঠে সে। হরিনারায়ণবাবুর রাগত কণ্ঠস্বর শুনেছে সে। দেখেছে ওই বৃদ্ধ আর মহিলাকে বাচ্চার হাত ধরে বের হয়ে যেতে। মেয়েটি তার খুবই চেনা। হ্যাঁ—লক্ষ্মীবৌদিই। ওর বাবাকে চিনতে পারে সে। ওরা চোখের জল চেপে বের হয়ে যাচ্ছে এ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে।

গৌর থমকে দাঁড়ায়।

হরিনারায়ণবাবুর এই কঠিন রূপ এর আগে দেখেনি গৌর। তার ধনী সত্তার এই প্রকৃত কঠিন পরিচয়টা পেয়ে চমকে উঠেছে গৌর।

চঞ্চলও বলে চলেছে, ওদের চিনি না জানি না। হঠাৎ এসে বলে এইসব কথা !

হরিনারায়ণবাবু বলেন, দরোয়ানকে বলে রাখো, ফের এলে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ওই শয়তানের দলকে। টাকার লোভে কিছু মোচড় মারার জন্য ছুটে এসেছে।

মনোরমা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলে সে, কোন মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে এতবড় মিথ্যে কথা বলতে আসবে না। বাবা—মেয়ে—নাতি ওরা।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, কেউ নয়। সব সাজানো। চাপ দিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে এসেছিল।

মনোরমা কি ভাবছে। চঞ্চল বলে, আমার কাজ আছে, আসছি।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, এই সব কথা নিয়ে মহাশ্বেতার সঙ্গে আলোচনা করবে না।

চঞ্চল গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়।

গৌর দেখছে ওকে বের হয়ে যেতে। গৌর শুনেছে সব। বেশ

বুঝেছে লক্ষ্মীবৌদি আর ওই ছেলেটাকে এরা পথেই বের করে দেবে। এদের সুনাম-গৌরবে এতটুকু কালি লাগতে দেবে না। তাই এরা সব ব্যবস্থাই করবে।

গৌর চঞ্চলকে বের হতে দেখে সেও ওদিকের বিরাট গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে যায়।

বৃদ্ধ জয়লক্ষ্মী আর ছেলেকে নিয়ে রাগে অপমানে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে ওদিকে একটা ট্যাক্সি দেখে তাতে উঠে পড়ে। চলছে তারা।

পিছনে চঞ্চলের গাড়িটা তাদের পিছু নেয়। চঞ্চল আজ হঠাৎ এতদিন পর ওদের উদয় হতে দেখে চমকে উঠেছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলেছে কিন্তু এরপরও কিছু করা দরকার। বাবা-মার কাছে, সমাজের কাছে এসব রটলে মুখ দেখানো দায় হবে। চঞ্চল ভাবছে পরের পর্যায়ের কথা। তাই পিছু নিয়েছে ওদের।

চঞ্চল জানে না গৌরও আসছে তার পেছনে।

ট্যাক্সিটা এসে থামলো সেই সস্তা দক্ষিণী হোটেলের সামনে। বৃদ্ধ চিদাম্বরম মেয়ে আর নাতিকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

চঞ্চলও নেমে ওই বাড়িটায় ঢুকলো।

ওদিক থেকে গৌরও দেখছে সবকিছু।

চঞ্চলের মানসম্মান আজ বিপন্ন হতে চলেছে। তার নীল রক্তে তাই মাতন জাগে। হরিনারায়ণবাবুরই ছেলে সে। আজ তাই সেও কৌশলী, কঠিন আর ধূর্ত হয়ে উঠেছে বিপদের সম্ভাবনা দেখে।

তার মনে পড়ে বোম্বাইয়ের ব্যাপারটা। এতদিন পর লক্ষ্মী এইভাবে তাদের ছেলেকে নিয়ে এসে একেবারে তাদের বাড়িতে হাজির হবে ভাবতেই পারেনি।

চঞ্চল এসেছে হোটেলে, খুঁজে খুঁজে ওই চিদাম্বরম-এর ঘরেই।

চিদাম্বরম দেখে চমকে ওঠে, তুমি!

জয়লক্ষ্মীও এগিয়ে আসে। ছেলেটা দেখছে ওই নবাগতকে।

জয়লক্ষ্মী এগিয়ে আসে, প্রণাম করতে যাবে। মনে হয় চঞ্চল বোধহয় ওদের নিয়ে যেতেই এসেছে।

বৃদ্ধ চিদাম্বরম বলে, বাবাকে বুঝিয়ে বলেছো চঞ্চল, তোমার স্ত্রী ছেলেকে ওঁরা যদি ওই বড় বাড়ির এক কোণে আশ্রয় দেন।

চঞ্চল বলে, ওসব সম্ভব নয়। আপনাদের চলে যেতে হবে কলকাতা থেকে। এসব কথা এখানে আর কোথাও বলবেন না। তার জন্য কত টাকা দিতে হবে বলুন? পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব—পুরো পঞ্চাশ! ওই নিয়েই মুখ বন্ধ করে চলে যান এখান থেকে।

—কি বলছো তুমি! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে জয়লক্ষ্মী।

চিদাম্বরম বলে, টাকার জন্য আসিনি আমরা, জীবনে লক্ষ্মীর স্বীকৃতির দরকার। সমাজে ওকে যাতা বলছে। ওই দুধের শিশুর কি কোন অধিকার নেই একটুকু পিতৃত্বের পরিচয় পাবার?

বলে চঞ্চল, বাজে কথা ছাড়ুন। বেশ পঁচাত্তর হাজারই দেব। চলে যান এখান থেকে।

লক্ষ্মী বলে, টাকার জন্য ওই খোকনের ভবিষ্যৎ বিক্রী করতে পারবো না। এই আমার শেষ কথা।

চঞ্চল বের হয়ে যায় রেগেই। জানায় সে, তাহলে সেটা তোমাদের লড়াই করেই পেতে হবে। আর তার ফল ভাল হবে না বলে গেলাম।

গৌরও চঞ্চলকে এই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে সেও পিছু পিছু এসেছিল। দোতলার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে গৌর শুনছে চঞ্চলের ওই কথাগুলো। আজ গৌর দেখছে ওই বড় বাড়ির মানুষদের প্রকৃত স্বরূপটা। ওরা যে এমনি নিষ্ঠুর স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব হতে পারে তা ভাবেনি এতদিন।

কিন্তু গৌর খুশি হয় লক্ষ্মীবৌদি ওদের সেই টাকা নিতে চায়নি, ফিরিয়ে দিয়েছে সেই টাকা এই কথা ভেবে।

চঞ্চল বেরিয়ে গেছে রাগতভাবে। গৌর ওদিকে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখেনি চঞ্চল।

দেখার মত মানসিক অবস্থাই তার নেই।

অসহায় চিদাম্বরম এবার বিপদে পড়ে। বলে সে, ওদের টাকার জোর আছে, যদি কোন বিপদে ফেলে মা। আমরা তো এখানে পরদেশী।

বলে লক্ষ্মী, তাইতো ভাবছি বাবা! যদি খোকনের কোন ক্ষতি হয়। কাজ নেই বাবা, চলো—চলেই যাই এখান থেকে।

এসে পড়ে গৌর। সে আজ মনস্থির করে ফেলেছে, যেভাবে হোক এই অসহায় বঞ্চিত মানুষদের সাহায্য করবেই।

গৌর বলে, কোন ভয় নেই বৌদি।

চমকে ওঠে লক্ষ্মী, গৌরদা!

গৌর দেখছে ওদের নিরাভরণ দরিদ্র অবস্থাটা। ছেলেটাকে দেখছে। মনে পড়ে, সেও অমনি অসহায় ছিল একদিন।

আজ বলে গৌর, তোমরা এখানে থাকবে। দরকার হয় আইন-আদালতেও যাবে। ওদের এই অন্যায়ের বিহিত করবোই।

—তুমি বলছো গৌরদা! লক্ষ্মী যেন ভরসা পায়।

গৌর বলে, হ্যাঁ বৌদি। আমিও দেখছি। খবর নোব রোজই এসে। দরকার হয় আমার চেনা উকিলের কাছে নিয়ে যাবো।

চিদাম্বরম বলে, একজন সাহায্য করবেন বলেছেন। তাহলে দেখুন। পরে খবর নেব।

পরদিন চিদাম্বরম এসেছে মহাশ্বেতার অফিসে লক্ষ্মী আর ওই ছেলেটিকে নিয়ে। সব কথাই জানায় তারা মহাশ্বেতাকে।

বলে লক্ষ্মী, বাড়ি থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলেন আমাদের ওই ভদ্রলোক। বাবাকেও যাতা অপমান করলেন। আর তাঁর ছেলে আমার স্বামীও মুখের ওপর জানালো আমাকে চেনে না জানে না।

—সেকি! মহাশ্বেতা অবাক হয়।

লক্ষ্মী বলে, শুধু তাই নয়, আমাদের হোটেলে এসে আমার স্বামী টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। বলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা দিচ্ছি ওসব নিয়ে কোন গোলমাল করবে না। চলে যাও কলকাতা থেকে। শাসিয়ে গেলেন, না গেলে নাকি ফল ভালো হবে না!

মহাশ্বেতা চটে ওঠে, এতবড় সাহস তার!

কি ভেবে বলে, তুমি কেস ফাইল করো।

—কিন্তু সে তো টাকার ব্যাপার! চিদাম্বরম জানায় কাতর কণ্ঠে।

মহাশ্বেতা বলে, মামলার খরচ লাগবে না। আর কিছুদিন কলকাতায় থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।

ছোট্ট খোকন এর মধ্যে মহাশ্বেতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে, চকোলেট দেবে না আন্টি!

লক্ষ্মী ওকে থামাতে যায়। হাসে মহাশ্বেতা, ওকে আদর করে, সিওর দেব!

মামলার কাগজপত্র তৈরী করতে হবে। ওকালতনামায় সই করে দেয় লক্ষ্মী। এবার স্বামীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতেই চমকে ওঠে মহাশ্বেতা।

লক্ষ্মী বলে, স্বামীর নাম চঞ্চল চৌধুরী, পিতার নাম হরিনারায়ণ চৌধুরী, ১৭।৫।২ বালিগঞ্জ গার্ডেন এপোর রোড!

মহাশ্বেতার সামনে যেন বাজ পড়ে। এই চঞ্চল চৌধুরীর প্রকৃত পরিচয়! অতীতে একটি নিরপরাধ মেয়ের সর্বনাশ করে—তার সন্তানকে অস্বীকার করে নিজে আজ আবার ঘর বাঁধতে চায়। সেই লোভী স্বার্থপর মানুষকে ভালোবেসেছিল মহাশ্বেতা! স্বপ্ন দেখেছিল ঘর বাঁধার!

আজ চঞ্চলও ঠকাতে চেয়েছে তাকে! মাথাটা কেমন ঘুরে যায়।

ছুটে আসে ভজহরি, দিদিমণি! দিদিমণি!

ওর ডাকে চাইল মহাশ্বেতা।

লক্ষ্মীও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, শরীর খারাপ!

মহাশ্বেতা বলে, না না!

ভজহরিই শোনায়, শরীরের দোষ কি! আজ উঠুন, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন। কাল ওসব হবে।

মহাশ্বেতাও যেন আজ বিশ্রাম চায়। বলে সে চিদাম্বরমকে, কালই আসুন।

ওরা চলে যায়।

মহাশ্বেতা বের হবার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময় চঞ্চলকে ঢুকতে দেখে চাইল মহাশ্বেতা। দেখছে ওকে।

আজ মহাশ্বেতার মনে পড়ে বারবার সেই অসহায় লক্ষ্মী আর তার ছেলেটার কথা। চঞ্চল যে এইভাবে তাদেরই নয় মহাশ্বেতাকে প্রতারিত করতে পারবে তা ভাবতে পারে না।

ভজহরি বলে, সামনে বিয়ে, দিদিমণিকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলুন। আমার কথা তো শুনবেন না।

—কি হল? চঞ্চল শুধোয়।

মহাশ্বেতা বলে, একটু মাথা ঘুরে গেছল!

চঞ্চল বলে, চলো, বাড়িতে ছেড়ে দিই মহাশ্বেতা। ইউ লুক টায়ার্ড।

মহাশ্বেতা এড়াতে চায় চঞ্চলকে আজ। বলে, ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো।

চঞ্চল বলে, গাড়ি রয়েছে, চলো।

মহাশ্বেতা চুপ করে বসে আছে।

চঞ্চল বলে, বাবা মা তো বিয়ের ব্যাপার নিয়ে খুবই ব্যস্ত। দিনরাত ওই চিন্তা। হ্যাঁ, আজ ভেবেছিলাম বিয়ের আংটিটা তোমাকে পছন্দ করিয়ে কিনে নেব। একটা আংটি দেখে এসেছি 'কমলহীরে'র সুপার! দামটা অবশ্য বেশীই বলছে, তিরিশ হাজার।

মহাশ্বেতা দেখছে ওকে। একটা আংটির দাম ওই এত টাকা! অথচ সেই বিয়ের মূলে রয়েছে একজনের প্রতি বঞ্চনা, একটি শিশুর ভবিষ্যতের সমাধি, অন্যজনকে ভালোবাসার ভান মাত্র।

চঞ্চল বলে, কালই ওটা কিনতে চাই। বিকেলে আসছি।

মহাশ্বেতা নীরব। সব শোনে মাত্র।

বাড়িতে মহাশ্বেতাকে ঢুকতে দেখে চাইল শেখরবাবু, চঞ্চলের মুখে অফিসে ওর অসুস্থতার খবর শুনে বলে, ডাক্তারকে ডাকবো!

মহাশ্বেতা বলে, তেমন কিছুই নয় বাবা। ব্যস্ত হতে হবে না।

শেখরবাবু বলে, তাহলেই ভালো। হ্যাঁ, চাটা খেয়ে বোস। নেমতন্নের ফর্দটা করছি।

মহাশ্বেতা বলে, এত তাড়া কিসের বাবা!

মহাশ্বেতা আজ ভাবছে কথাটা।

একদিকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। গাড়ি-বাড়ি, স্বামী, সম্মান সবকিছু! তার নারীজীবনের চাওয়ার সবই মিলবে, অন্যদিকে তার আদর্শ, নীতি, বিবেক।

আজ এক বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে সে। তার এক মন ভাবে ওই লক্ষ্মীদের কেস নেবে, না তাড়িয়ে দেবে তাদের! ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে যাক দক্ষিণের সেই গ্রামে, যা থাকে ওদের অদৃষ্টে তাই ঘটবে। এদিকে মহাশ্বেতা বিয়ে থা করে সুখী হবে। কিন্তু অন্য মন রুখে ওঠে। এই মিথ্যার সঙ্গে আপোস করে

একটি হৃদয়হীন মানুষকে কোনদিন সে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবে না। তার বাবার কথা মনে পড়ে। আদর্শের জন্য আজও সে হাসিমুখে সব কষ্ট স্বীকার করে চলেছে। বাবার স্বপ্ন মেয়েকেই কেন্দ্র করে। সে ওই অসহায় নিষ্পাপ নারী, ওই শিশুর ন্যায্য দাবিকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে নিজের সুখের সন্ধান করবে না। বরং সত্যের জন্যই সে লড়াই করবে। আইনের আশ্রয় দেবে তাদের। পিটিশনটা লিখছে সে রাত জেগে। এ যেন নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাই লিখছে মহাশ্বেতা।

ওঘরে শেখরবাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

উঠে আসে সে. এত রাত অবধি কাজ করছিস মা? জরুরী কেস নাকি!

—হ্যাঁ বাবা। কালই পিটিশনটা পেশ করতে হবে।

—কিসের কেস?

মহাশ্বেতা জানায়, পরে সব বলবো বাবা। এখন যাও, রাত হয়েছে শুয়ে পড়গে, আমারও হয়ে গেছে, উঠছি এবার।

পরদিন অনেক আশা নিয়ে এসেছে লক্ষ্মী বাবাকে নিয়ে। সে জানে না উকিল মহিলা কেমন আছেন।

চিদাম্বরম বলে, আমাদের অদৃষ্টই খারাপ মা। একজন রাজী হলেন সাহায্য করতে। তাঁরও শরীর না খারাপ হয়। তাহলে ফিরেই যেতে হবে শূন্য হাতে।

কিন্তু তা হয় না।

আজ মহাশ্বেতা লক্ষ্মীর মামলা দায়ের করে কোর্টে আর তদ্বির করে শমনও বের করে দেয় পার্টিদের।

চঞ্চল যথারীতি বিকেলে মহাশ্বেতার চেম্বারে এসে অবাক হয়। ভজহরি বলে, দিদিমণি কি জরুরী কাজে বের হয়ে গেছে।

—সে কি!

চঞ্চল আজ বিয়ের আংটি কেনার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। মহাশ্বেতাকে নিয়ে গিয়ে মাপমত আংটি কিনবে। কিন্তু এত দিনের মধ্যে এই প্রথম মহাশ্বেতাকে চেম্বারে পায় না।

—বাড়ি গেছেন?

চঞ্চলের কথায় ভজহরি বলে, না। কোন পার্টির ওখানেই গেছে বোধ হয় কেসের ব্যাপারে।

হতাশ হয়ে বের হয় চঞ্চল।

মহাশ্বেতা এসেছে লক্ষ্মীর হোটেলে।

ছেলেটা এর মধ্যে যেন আশ্টিকে ভালোবেসে ফেলেছে। মহাশ্বেতার কোল ঘেঁষে বসেছে সে। লক্ষ্মীর চোখে জল। চিদাম্বরম নীরব।

মহাশ্বেতা বলে, মামলায় জিততে গেলে সাক্ষী প্রমাণ এসব চাই। তোমাদের বিয়ে কিভাবে হয়েছিল, হিন্দুমতে—

চিদাম্বরম বলে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় নাম সই করেছিলাম। বোম্বাইয়ে।

—ঠিকানাটা?

চিদাম্বরম বলে, আমার পরিচিত একজন বোম্বাইয়ে থাকে। রামনাথন, ইঞ্জিনিয়ার। সে জানে সব। সেও সাক্ষী।

মহাশ্বেতা লিখছে, আরও কারা ছিল তাদেরও পাত্তা চাই।

লক্ষ্মী বলে, তারা ওর বন্ধু। আমার চেনা নয়। আর তারাও ছিল সেই সন্ধ্যায় হোটেলে, যেখানে ওই নাটক করে আমাকে তাড়িয়েছিল বদনাম দিয়ে।

চমকে ওঠে মহাশ্বেতা, তাদের নাম ঠিকানা চাই।

কিন্তু ওরা তা জানে না।

ওই ঘটনাটা ঘটে যাবার ব্যাপারটাকে হরিনারায়ণবাবু একেবারে সব ভুলে বিয়ের আয়োজনে মেতেছেন। কিন্তু মনোরমার মনে যেন একটা প্রশ্ন জাগে।

বারবার সেই ছোট ছেলেটার মুখ চোখ তার সামনে ভেসে ওঠে। ও যেন শিশু চঞ্চলই। আর বেশ কষ্টেই রয়েছে তাও মনে হয় মনোরমার। মেয়েটিকেও মনে পড়ে শান্ত নম্র মিষ্টি চেহারা। কি বেদনায় ও যেন ভেঙে পড়েছে।

মনোরমার মনে হয় এ বাড়ির মানুষগুলো কোন কঠিন সত্যকে গোপনই করতে চায়। গৌরকে তাই ডেকেছে মনোরমা।

গৌর জানে মাসীমা কি শুধুবে। তাই সেই সন্ধ্যাতেই গৌর

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। চঞ্চলদাকেও এ নিয়ে কিছু বলার দরকার।

মনোরমা গৌরকে পায় না।

চঞ্চল অবশ্য মায়ের কথায় বলে, ওসব বাজে কথা মা। একটা চক্রান্ত। ওসব নিয়ে ভেব না।

তবু মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারে না ভাবনাটাকে।

পরদিন সকালে হরিনারয়ণবাবু নেমন্তন্ন কার্ডগুলো পেয়েছেন। এবার লিস্ট মিলিয়ে ছাড়তে হবে। গৌরও রয়েছে।

মনোরমা কি ভাবছে। এমন সময় কোর্টের বেলিফকে পেয়াদার সঙ্গে এসে ড্রইংরুমে হাজির হতে দেখে চাইলেন। চঞ্চলও অবাক হয়।

—শমনটা নিতে হবে। আদালতের শমন।

পেয়াদার কথায় চাইলেন হরিনারায়ণবাবু।

—দেখি। হরিনারায়ণবাবু শমনটা দেখে গর্জে ওঠেন। এতবড় সাহস ওই মেয়েটা কোর্টে কেস করেছে চঞ্চল আর আমার নামে! ওই নাকি চঞ্চলের বিবাহিত স্ত্রী, তার সন্তানের জন্য কোর্টে মামলা করেছে!

হরিনারায়ণবাবু রাগে টেলিফোনটা তুলে তাঁর ল' অফিসারকে বলেন, কোর্টের কেস নম্বর, ব্যাপারটা জেনে যেন এখুনি চলে আসে বাড়িতে।

গৌর চুপ করে শোনে সবই।

মনোরমা বলে, ওগো, আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সত্যিই। ওই ছেলেটিকে দেখেই চিনেছি—ও চঞ্চলেরই ছেলে।

—না! হরিনারায়ণবাবু বলেন, ওরা চিট। কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই! বিয়ে! আর তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল নাকি চঞ্চল মিথ্যে বদনাম দিয়ে ওরা বলছে। কোন প্রমাণ আছে? নেই। আর একে মেনে নেওয়ার ফল জানো। সব কিছুর ভবিষ্যৎ মালিক হবে ওই জারজ রাস্তার ছেলে আর ওই মেয়েটা।

মনোরমা বলে, না জেনেশুনে একজন মেয়ের নামে এতবড় অপবাদ দিও না!

—থামো তুমি! হরিনারায়ণবাবু স্ত্রীকে ধমকে থামিয়ে দেন।

চৌধুরী কনসার্নের ল' অফিসার মিঃ পালিত খবরটা নিয়েএসে-

ছেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। আর সেই খবর শুনে চমকে ওঠেন হরিনারায়ণবাবু।

—ঠিক দেখেছো মিঃ পালিত!

—হ্যাঁ স্যার এ কেস লড়ছে ওই মহিলার হয়ে আমাদের মহাশ্বেতা সেন।

—হোয়াট! মহাশ্বেতার এতবড় সাহস! আমারই টাকায় ও ওকালতি পাস করে আজ আমার বংশের মুখে কালি দেবার জন্য এই মামলা লড়ছে?

হরিনারায়ণবাবুর কথায় মনোরমা বলে, এখনও কেলেঙ্কারী বাড়াবে? যে মেয়ে এই বাড়িতে বৌ হয়ে আসছিল—এতবড় পাওয়াকে তুচ্ছ করে মহাশ্বেতা ওই মেয়ে আর বাচ্চাটার এ বাড়িতে অধিকারের জন্য লড়ছে। এরপরও কি তোমাদের সন্দেহ হয় এসব মিথ্যে! বল্—বল্ চঞ্চল? আমি তোর মা। তোকে শুধুচ্ছি।

চঞ্চল কিছু বলার আগে হরিনারায়ণবাবু বলেন, আমি মানি না! আমি তাই এ কেস লড়বো। ওদের জেলে পাঠাবোই। আর মহাশ্বেতাকে দেখে নেব, কত বড় উকিল হয়েছে সে। বেইমান—বিশ্বাসঘাতক।

মনোরমা বলে, কে বেইমান, বিশ্বাসঘাতক এবার সেটা আদালতেই দেখতে চাও। সে সব কেলেঙ্কারীর আগে এসব মিটিয়ে নাও, আমার মন বলছে এসব সত্যি—ওই ছোট্ট ছেলেটাকে দেখেই বলছি একথা। মায়ের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

হরিনারায়ণবাবু বলেন, পালিত, তুমি এর জবাব দাও। এ কেস আমরা কনটেস্ট করবো। বড় অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টারই দাও। দরকার হলে বোম্বাই থেকে কাউকে আনাও।

গৌর নীরব দর্শকের মতই সব শুনছে। দেখছে বড়লোকের সম্মান বজায় রাখার জন্য গরীবকে নিষ্ঠুর বঞ্চনার ছবিটা।

চঞ্চল অবাক হয়। আজ বুঝতে পারে, মহাশ্বেতা কাল ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে গেছল। তাদের বিয়ের আংটি কিনতেও যায়নি।

আজ চঞ্চলের সারা মনে ঝড় ওঠে। গৌরকে আড়ালে বলে, তুই কিছু জানিস?

গৌর বলে, কই না তো!

চঞ্চল বলে, এ নিয়ে একদম মুখ খুলবি না। দেখছি ওদের। উড়ে এসে জুড়ে বসে মিথ্যে মামলা করে বদনাম করবে।

গৌর এবার বলে, কথাটা তো মিথ্যে নয়।

—মানে! চঞ্চল বলে, ওই মেয়েটাকে, আর তার ওই ছেলেটাকে মেনে নিতে হবে! ওর হোটেলের কাণ্ডটা জানিস না?

গৌরের মনে পড়ে সেই মাতাল প্রকাশের কথা। সে বার বার বলেছিল নরেনের কীর্তি সব ফাঁস করে দেবে। কিন্তু কীর্তির কথাটা শোনেনি। আজ মনে হয় হয়তো হোটেলের ব্যাপারটা সাজানোই।

গৌর বলে, কিন্তু যা দেখেছিলে তা হয়তো সত্যি নয়। লক্ষ্মী-বৌদি তেমন মেয়ে নয়।

ধমকে ওঠে চঞ্চল, ও নিয়ে কোন কথা বললে এ বাড়ির ভাত তোর উঠে যাবে গৌর! দূর করে দেব তোকে!

গৌর চুপ করে যায়। চঞ্চলের আজ অন্য রূপ। সে বলে, একদম মুখ বন্ধ করে থাকবি। তোর ভালোর জন্য বললাম। আর মহা-শ্বেতাকেও দেখছি—ওই লক্ষ্মীকেও।

গৌর বুঝেছে একটা গণ্ডগোলই বাধাতে চায় এরা। গৌরের অন্নও তুলে দেবে এখানে। হাসে গৌর, ড্রাইভারি জানে, তার কাজের অভাব হবে না। তবু সত্যের জন্যই লড়বে সে।

তাই ছুটে যায় সে মহাশ্বেতার কাছে। কোর্টে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল সে। গৌরকে দেখে চাইল। গৌর বলে, তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে ওদিকে। তোমাকেও ছাড়বে না মহাশ্বেতাদি। ওই লক্ষ্মীবৌদিকেও।

—তাই নাকি!

গৌর বলে, আজ ওদের আসল রূপটাকে দেখেছি দিদি। সম্মান রক্ষার জন্য ওরা বাপবেটায় ক্ষেপে উঠেছে। মাসীমা এসব চাননি। বলেন, মিটিয়ে নাও। কিন্তু বাপবেটায় তা মানবে না। ওরা কেসই লড়বে।

মহাশ্বেতা বলে, কিন্তু লক্ষ্মীদের সরাতে হবে ওখান থেকে। না হলে বিপদ হতে পারে ওদের।

গৌর কি ভেবে বলে, আমার এক বন্ধুর বাড়ি খালি আছে শ্যামবাজারে। সেখানে নীচে ওর কারখানা উপরে তিনটে ঘর, বাথ-

রুম, কিচেন সব আছে। একদম সেফ জায়গা।

মহাশ্বেতারও যেন জেদ চেপে গেছে। বলে সে, ওখানেই যেতে হবে ওদের। এখুনিই। চলো!

ওরা বের হয়ে যায়।

শেখরবাবু দেখছে মেয়েকে। কি যেন একটা দারুণ ব্যস্ততার মধ্যেই রয়েছে। বলে সে, খেয়ে যা মা!

মহাশ্বেতা বলে, বাইরে খেয়ে নেব বাবা। এখন সময় হবে না।

চঞ্চল তৈরি হয়েই এসেছিল। কারখানার কাজ চালাতে গেলে এমন কাজ মাঝে মাঝে তাদের করতে হয়, ভয় দেখিয়েই চিদাম্বরম লক্ষ্মীদের এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করবে, যাতে মামলা এগোতে না পারে। তাই হোটেলে এসে হাজির হয় তারা।

হোটেলওয়ালাও দক্ষিণী লোক। পরদেশে এসব ঝামেলা পছন্দ করে না। তাই ওদের সদলবলে ঢুকতে দেখে বলে, কাকে চাই স্যার।

—দোতলায় চিদাম্বরম আছেন? আরে জবাব দে—

হোটেল মালিক বলে, ছিলেন। কিন্তু একটু আগেই এ হোটেল ছেড়ে তাঁরা চলে গেছেন।

—মিথ্যে কথা!

—দেখে আসুন স্যার!

দেখেও আসে কজন। ঘরটা খালি।

চঞ্চল বলে, কোথায় গেছে তারা?

—তাতো জানি না। বললেন হাওড়া স্টেশনেই যাচ্ছেন!

চঞ্চলের কোন চ্যালা বলে, ভয়ে কেটে পড়েছে স্যার!

চঞ্চল কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়।

লক্ষ্মীদের তাড়িয়েছে কিন্তু মহাশ্বেতাকে এর জন্য জবাবদিহি করতেই হবে তার কাছে। আবার মনে হয় মহাশ্বেতাই হয়তো কৌশল করে ওই মামলা হাতে নিয়ে কৌশলে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে ওই কেস আর অন্য কারো হাতে না যায়। মহাশ্বেতা সত্যিই ওকালতি চালে ওই লক্ষ্মীদের সরিয়ে নিজের ওই বাড়ির বৌ হবার পথটা পাকাই করেছে। নিশ্চিন্ত হয় চঞ্চল।

হরিনারায়ণবাবু অফিসে কাজে ব্যস্ত। তবু মাঝে মাঝে কথাটা

মনে পড়তে বিপন্ন বোধ করেন। চঞ্চল ফিরে এসে বাবার চেম্বারে গিয়ে ব্যাপারটা জানাতে হরিনারায়ণবাবুও ভাবছেন, শুধোন, ওরা চলে গেছে?

চঞ্চল বলে, হোটেলওয়ালাই বললো, মনে হয় মহাশ্বেতা ওদের ভোলাবার জন্য কাগুজে মামলা করে দিন পড়বে-টড়বে এইসব বলে ভাগিয়ে দিয়েছে। এ মামলা আর কোনদিন উঠবে না।

হাসছেন হরিনারায়ণবাবু, নাঃ, মহাশ্বেতা দারুণ চালই চেলেছে তাহলে, চালবে না—উকিলের মেয়ে, আজ তবু দেখা করো তার সঙ্গে। এসব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা ভালো। তবে মনে হয় এতকিছু পাবার লোভ মেয়েরা সহজে ছাড়তে পারে না। তাই এইভাবে কাটিয়েছে ওদের। না হলে মহাশ্বেতা আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে এটা অসম্ভব। ভাবাই যায় না।

চঞ্চল তাই এসেছে অফিসের পর মহাশ্বেতার চেম্বারে।

চঞ্চল বলে, অনেক ধন্যবাদ মহাশ্বেতা।

মানে! চাইল মহাশ্বেতা।

চঞ্চল বলে, দারুণ একখানা ওকালতি চাল চেলেছো। ওসব মিথ্যা কেস তবু ও নিয়ে কাগজওয়ালারা নানা কেচ্ছা গাইত, তুমি কৌশলে ওদের কেসটা এইভাবে ফাইল করে তাদের তাড়িয়েছ কলকাতা থেকে। এখন ও কেস পড়ে পচুক গুদামে। নাইস্ অব ইউ!

হাসছে চঞ্চল। অবাক হয়ে দেখছে মহাশ্বেতা চঞ্চলকে, টাকার গরমে ওরা নিজেদের স্বার্থটাই দেখে চিরকাল। আর মহাশ্বেতাকেও তাই ভেবেছে।

চঞ্চল বলে, চলো। আজই ওসব কেনাকাটা সেরে নিতে হবে। বিয়ের পর দিন কয়েকের জন্য দার্জিলিংই চলো। হনিমুন করে আসবো।

মহাশ্বেতার মনে পড়ে লক্ষ্মীর কথা। বলে মহাশ্বেতা, সেবার তো উটকামণ্ডে গেছলে হনিমুন করতে। লেকের ধারে এডগার হোটেলে উঠেছিলে না?

চমকে ওঠে চঞ্চল, কি বলছো এসব!

দেখছে সে মহাশ্বেতাকে। মহাশ্বেতা বলে, একজনকে নির্মম-ভাবে ঠকিয়ে তার সর্বনাশ করে আবার অন্যজনকে ঠকাতে চাও?

মেয়েরা তোমাদের কাছে খেলার পুতুল, না?

চঞ্চল সবই বুঝেছে। তবু বলে সে, কি বলছো কিছুই বুঝছি না।

মহাশ্বেতা বলে, বুঝবে। আদালতে!

—অর্থাৎ মামলাই করছো তাহলে? চঞ্চল এবার বদলে যাচ্ছে। মহাশ্বেতা দেখছে ওকে। বলে চঞ্চল, ঠিক আছে। বেইমানির জবাবও দেব।

মহাশ্বেতার মনে হয় ওই ধনীর দুলাল যে একটি হৃদয়হীন দানব তা সেও বুঝতে পারেনি এতদিন।

চঞ্চল বলে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চলেছো তুমি!

মহাশ্বেতার কাছে আজ সব চেনা হয়ে গেছে। বলে সে, বালু-চরে ঘর বাঁধার সাধ আমার নেই।

—কিন্তু আমাদের সর্বনাশ করতে গেলে আমরাও তোমাকে ছাড়বোনা মহাশ্বেতা। আমাদের সম্মান, বংশমর্যাদা—

মহাশ্বেতা বলে, কথাটা সেদিন মনে ছিল না? একটি অসহায় নিরপরাধ মেয়ে আর ওই শিশুর কথা ভেবেছো কোনদিন? তাদের মর্যাদা নেই? সম্মান নেই? আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি, তোমরা ওকে মেনে নাও। আমার নিজের স্বপ্ন দেখার সাধ নেই। ওদের সুখী করো।

—একটা নষ্টা মেয়েকে মেনে নিতে হবে?

—নষ্টা সে নয়! তার প্রমাণ যদি দিই!

মহাশ্বেতার কথার জবাবে চঞ্চল বলে, তোমাকে বিশ্বাস করি না। তাই সব সম্পর্ক মুছে এবার তোমার এই আদর্শের নিপাতই করবো!

বের হয়ে যায় চঞ্চল!

হরিনারায়ণবাবু সব শুনে গর্জে ওঠেন, মহাশ্বেতার এত বড় সাহস!

শেখরবাবু হরিনারায়ণকে আজ দেখে চমকে ওঠে। বাল্যবন্ধু তারা। কিন্তু আজ এতবড় কাণ্ডটা ঘটে যেতে এতদিনের সেই বন্ধুত্ব আজ নিমেষেই যেন মুছে যায়। ক'দিন ধরে মহাশ্বেতাকে ব্যস্ত,

চিন্তিত দেখেছে। রাতেও যেন ঘুমোয়নি।

আজ হরিনারায়ণের কাছে ব্যাপারটা শুনে চমকে ওঠে শেখর কি বলছো হরিনারায়ণ, তোমার ঘরের বৌ হয়ে যাচ্ছিল, এতবড় সৌভাগ্যকে সে এইভাবে শেষ করবে ?

হরিনারায়ণ বলে, তার নিজের ভবিষৎ সে অন্ধকারে ঠেলে দিক আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু এমনি একটা বাজে কেলে-ঙ্কারীতে আমাদের জড়াবে তা সইবে না!

মহাশ্বেতা বাড়ি ঢুকে সামনে হরিনারায়ণবাবুকে রুদ্রমূর্তিতে দেখে চাইল।

শেখর বলে, এসব কি শুনছি মা! নিজের এতবড় সর্বনাশ করলি ?

মহাশ্বেতা বলে, যা সত্য, তার জন্যই লড়ছি বাবা। আমার আদর্শ---

হরিনারায়ণ বলে ওঠে, আদর্শ! বেইমানের আবার আদর্শ! ভিখিরীর আবার ন্যায়নীতি! আমারই খেয়ে আমার পয়সায় সে পাস করে উকিল হয়ে আমারই সর্বনাশ করতে চাও বেইমান—

মহাশ্বেতা কঠিন কণ্ঠে বলে, আপনার ওখানে পরিশ্রম করে মাইনে নিয়েছি। আপনি দয়া করেননি, দানও নিইনি। আর সত্য ন্যায় আদর্শ ধনীদের নেই। সেটা এখনও খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যেই আছে। তারা বেইমান নয়। তাই আপনাদের এতবড় অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদই করছি, আদালতে তাই প্রমাণও করবো। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে হয় দেব।

হরিনারায়ণ বলেন, সেই চেষ্টাই করো তাহলে।

বের হয়ে যান হরিনারায়ণ।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। অন্ধকারে একটা মোমবাতি জ্বালে শেখরবাবু। সারা ঘরে স্তব্ধতা নামে। শেখরবাবু বুঝেছে বিপদের গুরুত্বটা। বলে সে, এ কি করলি মা! নিজের কথাও ভাবলি না ?

মহাশ্বেতা বলে, এত বড় মিথ্যেকে মেনে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন আমার আর নেই বাবা। আর ওদের এত বড় অন্যায় অত্যাচারকে মেনে নিতে পারিনি। তাই সেই অন্যায়ের বলি একটি অসহায় মেয়ে

একটি অসহায় শিশুর হয়ে এই মামলা আমি করবোই বাবা। তুমি বলেছিলে, অসহায় নিপীড়িতের জন্য লড়বে। তুমি জীবনভোর তাই করে এসেছ। তোমার সেই অসমাপ্ত কাজ আমিই শেষ করতে চাই বাবা। এই আমার ব্রত।

শেখরবাবু দেখছে মেয়েকে। আজ মহাশ্বেতা নিজের ঘরের স্বপ্নকে তুচ্ছ করে ওই কাজে এগিয়ে এসেছে। শেখরবাবুর শূন্য বুক যেন কি এক আশার আলোয় ভরে ওঠে। তার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। আজ মহাশ্বেতা বহুমূল্য দিয়ে সেই পথেই এগিয়ে চলেছে।

শেখরবাবু বলে, তোকে আশীর্বাদ করি মা তুই সফল হ। আমার আজ কোন ক্ষোভ নেই মা। তুই ঠিক কাজই করেছিস। ঈশ্বর তোর সহায় হোন মা!

বৃদ্ধ মানুষটির চোখে কি এক আনন্দে অশ্রু নামে।

খবরের কাগজওয়ালারা যেন মাটির তলা থেকে সব খবর খুঁচিয়ে বের করে। এই মামলার শুরু হতেই তাদেরও একটা মুখরোচক খবর—স্টোরি মিলে যায়।

এর মধ্যে তারা মহাশ্বেতার আগেকার কেসের জয়—এই কেসের ইতিহাস, ছবি সমেত ছেপেছে। তারা খুঁজছে ওই লক্ষ্মী আর তার ছেলেকে। কিন্তু তাদের খবর মহাশ্বেতাও জানায়নি। ফলে কাগজ-ওয়ালারা চঞ্চল, মায় চৌধুরী কনসার্নকে নিয়েই পড়েছে।

এ আর এক বড় বাড়ির বধূ নির্যাতনের কাহিনী না হোক—বধূ বঞ্চনার কাহিনী-ই আর পাঠকরা এ খবরটা খেয়েছেও ভালো। তাই কাগজওয়ালারা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

হরিনারায়ণবাবু সকালে কাগজগুলো দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন।

চঞ্চল তার ল' অফিসার মিঃ পালিতকে বলেন, এদের বিরুদ্ধেও মানহানির মামলা করো।

মনোরমা বলে, আর বাকী আছে মানহানি হতে? এরপর আদালতে দাঁড়াবে এ বাড়ির বৌ এ বাড়ির নাতির হাত ধরে। দেখাবে তোমাদের মহত্ত্বের পরিচয়টা। তাই বলি ঢের হয়েছে, মিটিয়ে নাও। তোমাদের সম্মানে বাধে আমি যাব।

—না। ওদের প্রমাণ করতে দাও মেয়েটির দোষ নেই। সীতাকেও

অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

হরিনারায়ণবাবুর কথায় মনোরমা বলে, যা ভালো বোঝ করগে তোমরা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তবু মাথা নুইতেও দোষ! সম্মানে বাধে?

মিঃ পালিত বলে, আমরাও জবাব দিয়েছি স্যার।

হরিনারায়ণ বলেন, সবচেয়ে বড় অ্যাডভোকেট দাও।

গৌর চুপ করে শোনে এদের সব পরিকল্পনার কথা।

আর সে সব খবরই পেঁাছে দেয় মহাশ্বেতার কাছে।

মহাশ্বেতা ওদের জবাবটার কপি আনিয়ে সব পয়েণ্টের ফাঁক খুঁজছে। তার নিজের [illegible]জেতার পথ তৈরি করতে চায়।

বলে মহাশ্বেতা, বোম্বাইয়ে ওদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের কপি আনিয়েছি। তুমিও সাক্ষী আছো। আর সেই মিঃ রামনাথন। চিদাম্বরম মিঃ রামনাথনকে চিঠি দিয়েছে। ও বোধ হয় আসতে পারে। সাক্ষীও দেবে। কারণ এখন রামনাথন চণ্ডলদের ফার্মে আর কাজ করে না।

গৌর বলে, তাহলে তো কাজ পাক্কা।

মহাশ্বেতা বলে, না, ওতে বিয়েটা প্রমাণিত হবে। কিন্তু পরে যা ঘটেছিল হোটেলে, সেই ঘটনা তো মূল। ওতে লক্ষ্মী যে নষ্টা সেটা ওরা প্রমাণ করতে চাইবে, আর তা পারলে লক্ষ্মী কেসে হেরে যাবে।

গৌর বলে, তা কিন্তু সত্যি নয়। মনে হয় সবটাই সাজানো।

—তার তো সাক্ষী প্রমাণ কিছুই নেই গৌর।

গৌর কি ভাবছে। মহাশ্বেতা বলে, তাই ভয় হয় গৌর। এত চেষ্টা করেও হেরে যাবো! ওদের ওপর ন্যায়বিচার হবে না? আইন তো সাক্ষ্যপ্রমাণ চাইবে।

গৌর বলে, আমি দেখছি দিদি।

লক্ষ্মীও এসেছে ওদের বাড়িতে। খোকন জানে না তার ভাগ্য নিয়ে এমনি ঝড় উঠেছে। সে একটা খরগোস নিয়ে শেখরবাবুকে কি বলে চলেছে। এ যেন তার একটা দাদু।

শেখরবাবুও ভাবছে কথাটা। বলে সে, সেই বন্ধুদের পাওয়া যায় না গৌর?

গৌর বলে, সেই চেষ্টাই করছি।

মহাশ্বেতা বলে, যা করার সাতদিনের মধ্যেই করতে হবে। না হলে ওরা চাইবে তাড়াতাড়ি মামলা শেষ করতে।

ফড়েপুকুরের তার বন্ধুর তেলেভাজার দোকানে এসেছে গৌর।

মদন বলে, কি রে! তোর তো পাত্তাই নেই?

গৌর বলে, কাজের চাপ রয়েছে। তা হ্যাঁরে সেই প্রকাশ—

—মাতালটার কথা বলছিস?

—হ্যাঁ! ওই বস্তিতে থাকতো।

মদন কড়াইয়ে গরম চপ তুলতে তুলতে বলে, দেখলাম তো কাল। একেবারে কাহিল অবস্থা। আছে ওই বস্তিতেই—

গৌর খুঁজে খুঁজে বস্তির প্রায়ান্ধকার ঘুপচিতে ঢুকেছে।

—প্রকাশবাবু!

প্রকাশ চারপাই-এ বসেছিল। হাতে কলাইকরা গ্লাসে দিশী মদ। ওর ডাকে চাইল, কে! আরে গৌর না?

গৌর এর মধ্যে তৈরি হয়ে এসেছে। চাদরের নীচে থেকে দুটো দিশী মদের বোতল বের করতে দেখে প্রকাশ বলে, বোস. বোস।

গৌর বলে, বসতে আসিনি, সেই নরেন বিমলের খবর চাই।

প্রকাশ এখন সবকিছু দিতেও প্রস্তুত। বলে, পাবে! তবে বিমলটা এখন বিয়ে-থা করেছে।

—আর নরেনদা!.

প্রকাশ বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। শালা আমাদের ঠকিয়ে দোকান খুললো। আমাদের ফাঁকি দেবার জন্য দোকান খুললো বৌ-এর নামে। আমাদের মালও খাওয়ায় না, চিনতেও পারে না শালা। ব্যস। একদিন সব ফুস্—যা!

—মানে! কি হলো নরেনদার?

আরাম করে দু'ঢোঁক মদ গিলে মুখে আদানুন-এর ছিটে মেরে একটা ঢেকুর তুলে বলে, বৌটা তার কে পাড়াতুতো দাদার সঙ্গে—নরেনটাকেও ওই দাদা এইসা ধোলাই দিল ব্যাটা এখন নেচে নেচে চলে। সব হারিয়ে এখন আবার ট্যাঁক-খালির জমিদার। কার দয়ায় পড়ে থাকে তার কারখানার চালায়। পাহারাদারি করে—ব্যস।

গৌর বলে, কোথায় থাকে জানো?

প্রকাশ মনে মনে ঠিকানাটা স্মরণ করার চেষ্টা করে।

নরেন বোসের দিন এখন বড়ই দুঃখে কাটছে। ভেবেছিল সুখে-শান্তিতে থাকবে। তাই অতীতে সে নানা চাল ধান্দা করে চণ্ডলের বৌটাকে তাড়িয়েছিল, আর কৌশল করে হাজার পঞ্চাশ টাকাও আমদানী করে বন্ধুদের ঠকিয়ে নিজে দোকান করেছিল। চলছিল ভালোই। চণ্ডলকে আর তার দরকার নেই। তাই এড়িয়ে গেছল। বিমল, প্রকাশ এলে দোকানের কর্মচারীদের রেখে সে কেটে পড়তো!

নরেন বিয়েও করলো। দোকান ভালোই চলছে। বৌ-এর নামেই ট্রেড লাইসেন্স—বাড়িভাড়া। বৌটাও বেশ চালুই। সেও দোকানে বসে।

কিছুদিন পরই আবির্ভাব হল গুপীনাথের! ওই পাড়ান মস্তান। দোকানে এসে বসে। নরেনের বৌ সবিতার সঙ্গে গল্পগাছা করে। সেই পাড়ার কোন নেতাকে বলে কোন পথে সবিতাকে মাদার ডায়েরীর দুধের এজেন্সীও এনে দেয়। তাই আসা-যাওয়াও বাড়ে গুপীনাথের। দোকানেই নয়, বাড়িতেও আসে গুপীনাথ। দুজনে সিনেমায় যায়, বেড়াতেও যায়।

নরেনের সঙ্গেও বাধে এই নিয়ে, একটা রাস্তার গুণ্ডা, তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে হবে।

সবিতা বলে, তুমি কি! তবু গুপীনাথ কত কাজে লাগে জানো? দুধের পারমিট পেতে কোনদিন? খুব তো পলিপ্যাকেটে ইনজেকশন দিয়ে দুধ বের করে জল পুরে মালের পয়সা করো। মুরোদ বোঝা গেছে।

কথায় কথা বাড়ে।

সবিতাও শুরু করে খেউড়, নরেনও মালের ঘোরে ছিল। স্ত্রীকে ওই সব কথা বলতে দেখে হাতই চালায়।

মার খেতে সবিতাও রেগে ওঠে।

গুপীনাথও সুযোগ খুঁজছিল। নরেনকে এবার মৌকা পেয়ে বেশ ঘা কতক উত্তম-মধ্যম দিয়ে একেবারে পেড়ে ফেলে।

নরেনও রুখে ওঠে, আর গুপীনাথের এক লাথিতে বাঁ পাটার হাড়েও চিড় ধরে যায়।

এর ক'দিন পর নরেনকে ফেলে রেখে সবিতাও গুপীনাথের

সঙ্গে উধাও হয়ে পাড়ার অন্য অঞ্চলে তারা ঘর বাঁধে।

নরেন দোকানে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী এবং তার স্ত্রীর নামের দোকান সবকিছুরই মালিক এখন গুপীনাথ।

সেই-ই শাসায়, এখনও জানে বেঁচে আছিস—ঠ্যাংটাই গেছে। ফের এলে আর ফিরতে হবে না। খতম করে লাশ কোন ম্যানহোলে পুঁতে দেব শালার।

গুপীনাথ ওই কর্ম ইতিপূর্বেও করেছে পাড়ার দাদাদের মদতে। আবার করবে না তারও কোন গ্যারাণ্টি নেই।

নরেনের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে। তার সবকিছু আজ হারিয়ে গেল। ঘরও ভেঙে গেল। মনে পড়ে অতীতে সেও ঘর ভেঙেছিল। চঞ্চলের মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে। মিথ্যা অপবাদে তাড়িয়েছিল জয়লক্ষ্মীকে। আজ যেন সেই অন্যায়ের বিচারই হয়ে গেল।

বাঁচার কোন পথ নেই। পাটাও টেনে টেনে চলতে হয়। আর খিদে তো মানুষকে ছেড়ে যায় না। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ক্ষুধা তার নিত্যসঙ্গী। তাই দুমুঠো অন্নের জন্য আজ নরেন বোসকে ভাবতে হয়।

গিয়েছিল রমেশ জসোয়ালের কাছে। ওর এখন দুতিনটে রেশনের দোকান। বহু ফলস কার্ড তার কব্জায়। সেই সব মাল সে গোপনে বিক্রী করে। রেশনের মালেও ভেজাল দেয়। রেপসিডের তেলও পাচার করে। ওই মাল পাচার করার সময় ধরা পড়ে হাজতে যায়। তারপর বের হয়। ভুয়ো কার্ডের খবর ও সাত-পাঁচে মামলায় জড়িয়েছে রমেশ। আর শেষ অবধি ওই মহাশ্বেতাকেই ধরেছে রমেশ। মোটা লোকটা কদিনেই দুবলা পাতলা হয়ে গেছে।

এককালে বেশ সৌখীনই ছিল। তখন ফুর্তিফার্তা করেছে। নরেন, প্রকাশদেরও চলেছে তার ঘাড়ে। রমেশ আজ এতদিন পর ন্যাড়া নরেনকে দেখে এড়াতে চায়। তার মনমেজাজও ভালো নেই। বলে সে, আভি কাম আছে নরেন।

নরেন চেপে বসে। আজ তার কিছু টাকার দরকার। বলে নরেন, কিছু মালকড়ি ছাড়ো গুরু।

রমেশ এখন হাজত, মামলা, কোর্টকাছারি নিয়ে ব্যস্ত, চিন্তিত। এখন টাকা চাইতে গর্জে ওঠে রমেশ, ভাগ্ বে। টাকার কি পেড়

আছে আমার যে নাড়া দিলেই টাকা পড়বে। শালা—যা খাটকে খাও গে। ভিখ মাংতা—ভাগ শালা!

নরেনের সব গেছে। তবু ভুয়ো বংশমর্যাদাটা তার রয়ে গেছে। বলে সে, জানো আমি শ্যামবাজারের বোস বাড়ির ছেলে। তুই ব্যাটা কালকের যোগী—আমাকে বলিস ভিখিরী? তোর ট্যাকার দ্যামাক ছুটিয়ে দেব।

বের হয় নরেন বেশ রেগেই। কোথায় যাবে জানে না। সারাদিন খাওয়াও জোটেনি। এমন সময় গৌরকে আসতে দেখে চাইল। গৌরও একনজরেই রকে বসা মূর্তিটিকে চিনেছে।

—নরেনদা!

নরেন এখন চুপসে গেছে। একমুখ দাড়ি। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। জামাকাপড়ও ধুলোময়লায় বিবর্ণ।

নরেন বলে, আজ আমার সর্বনাশ হয়েছে গৌর। চণ্ডলের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই। সব শালা বেইমানি করেছে।

প্রকাশ বলে, তুই করিসনি! শালা বেইমান পাপী।

নরেন বলে, গ্লানিভরা কণ্ঠে, করেছিলাম, পাপ অনেক করেছি রে। ওই চণ্ডলের ঘর ভেঙেছিলাম আমিই। ওর সতীলক্ষ্মী বৌটাকে চরম বদনাম দিয়েছিলাম। শালা রমেশকে শেঠ সাজিয়ে হোটেলের ঘরে ঢুকিয়ে লক্ষ্মীকে অপমান করেছিলাম। মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে চণ্ডল, লক্ষ্মীর সর্বনাশ করেছি ঘর ভেঙেছি। তাই আজ আমারও সব হারিয়ে গেছে, পথে পথে ঘুরছি।

গৌরের চোখের সামনে ছবিটা ফুটে ওঠে। অতীতের হোটেলের সেই নাটকটা তাহলে মিথ্যে, সাজানো। মহাশ্বেতাদিকে এদের কথাই বলতে হবে। আজই—

সামনে একটা ট্যাক্সি দেখে তাকালো গৌর। গাড়িটা এসে দাঁড়াতে বলে গৌর—প্রকাশদা, নরেনদা, ওঠো। চলো।

নরেন শুধোয়, কোথায়?

গৌর বলে, টাকা পাবে। থাকার জায়গারও ব্যবস্থা হবে।

প্রকাশ আর একটা আইটেম যোগ দেয়।

—মাল! মাল দেবে তো!

—তাও দেব। চলো!

ট্যাক্সিতে দুই মূর্তিকে তুলে গৌর সোজা মহাশ্বেতার বাড়ির দিকেই চলেছে। এদের এখন চেম্বারে নিয়ে যেতে চায় না গৌর। কে জানে চঞ্চলের লোকজনও ঘুরছে। তারাও বোধহয় এদের সন্ধানে আছে। কারণ মামলার এরাই মূল সাক্ষী।

মহাশ্বেতাও ভাবছে এই মামলাটা নিয়ে। খবরের কাগজওয়ালারা এবার মহাশ্বেতার সঙ্গে চঞ্চলের বিয়ে হবার কথা চলছিল ও দিনক্ষণ, ঠিক সেই সব খবর বের করে একটি মহিলার আইনের জন্য আদর্শ নীতির জন্য আত্মত্যাগের খবরও ছেপেছে।

জয়লক্ষ্মী ইংরেজী কাগজে খবরটা পড়ে চমকে ওঠে। এখন তারা মহাশ্বেতার আশ্রয়েই আছে। গৌরই তাদের দেখাশোনা করে। শ্যামবাজারে তার বন্ধুর বাড়িতে রেখেছে।

জয়লক্ষ্মী সব শুনে অবাক হয়।

আজ মেয়ে হয়ে সে বুঝতে পারে একজন মেয়ের জীবন থেকে তার প্রেমিকাকে সরিয়ে নেওয়ার যন্ত্রণা কত বেশী।

আজ লক্ষ্মীও মহাশ্বেতাকে সেই বঞ্চনার মুখে এনে ফেলেছে এ কথাটাও তার ভাবতে খারাপ লাগে।

জয়লক্ষ্মী এসেছে মহাশ্বেতার বাড়িতে।

—কি খবর ?

মহাশ্বেতা দেখছে লক্ষ্মীকে। চেহারাটা উস্কোখুস্কো ওর। মহাশ্বেতা বলে, রাতে ঘুমোওনি ?

লক্ষ্মী বলে, আমি না জেনে মস্তবড় অন্যায় করেছি দিদি!

—কেন! মহাশ্বেতা অবাক হয়।

লক্ষ্মী বলে, মেয়ে হয়ে একজন মেয়ের জীবন থেকে তার আপনজনকে কেড়ে নেওয়ার দুঃখ আমি বুঝি দিদি। আমি সেই অন্যায়ই করেছি। আমি জানতাম না আপনারা পরস্পরের খুব পরিচিত। আপনাদের বিয়ে হতে চলেছিল!

চমকে ওঠে মহাশ্বেতা, এসব জানল কি করে ?

কাগজটা দেখায় লক্ষ্মী। বলে সে, এসব মামলায় কাজ নেই দিদি। আমি ফিরেই যাবো। আর—

মহাশ্বেতাই এবার নিজেকে যেন অপরাধী মনে করে। বলে সে, এসব কথা চঞ্চল আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। আমাকেই

ঠকিয়েছে সে। সব জানার পর আর আমার মনে সেই দুর্বলতার লেশমাত্র নেই লক্ষ্মী। এখন আমার হারাবার দুঃখও নেই। তাই ও প্রশ্নই ওঠে না। এ পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে মেয়েদের মর্যাদা স্বীকৃতির লড়াই লক্ষ্মী। এখানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, নীতির প্রশ্নই বড়। তাই এই লড়াইয়ে আমাদের জয়ী হতেই হবে। তুমি পিছিয়ে যাবার কথা ভাববে না।

বলে লক্ষ্মী, কিন্তু তার জন্য সাক্ষী প্রমাণ—

মহাশ্বেতাও ভাবছে কথাটা। সেই অস্ত্র তার হাতে নেই। ওই হরিনারায়ণবাবুরাও বড় অ্যাডভোকেট আনিয়েছে। দরকার হলে ব্যারিস্টারও দেবে। আপীলও করবেই।

হঠাৎ এমন সময় গৌরকে ওই দুটো ঝোড়ো কাকের মত মূর্তিকে টানতে টানতে ভিতরে আনতে দেখে চাইল।

প্রকাশ বিড়বিড় করে, টানছো কেন মাইরী। আমি কি মাতাল! আমি ঠিক আছি।

টক্কর খেয়ে পড়তে পড়তে সামলালো।

আর ল্যাংড়া নরেন বলে, পড়ে যাবো যে!

গৌর দুটোকে চেয়ারে বসিয়ে বলে, এই নাও তোমার লড়াইয়ের ব্রহ্মাস্ত্র দিদি!

লক্ষ্মী ও চিনেছে তাদের! বলে সে, গৌর, এরা চঞ্চলের সেই বন্ধুরা না?

নরেনও চিনেছে লক্ষ্মীকে। দেখছে ছেলেটাকে। বলে সে, বৌঠান! নমস্কার! শালা চঞ্চল কোতায়? মিটমাট হয়ে গেছে?

গৌর বলে,সে তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘরছাড়া করেছে সেই বোম্বাই থেকেই। তখন ওর গর্ভে ছিল ওই সন্তান। আজ ওদের কোন ঠাঁই নেই, পথে পথে ঘুরছে!

নরেন পথে ঘোরার যন্ত্রণাটা বোঝে আজ। ঘর হারানোর দুঃখও। তার মনের অতলে জমে থাকা ব্যর্থতার জ্বালাটা ফুটে ওঠে। বলে সে, তাই নাকি!

প্রকাশ বলে, শালা বড়লোকের বাচ্চার এত বড় হিম্মৎ। দেব শালার হাটে হাড়ি ভেঙে। কেন ঘরে নেবে না মাগ ছেলেকে! বল নরেন ওদের কি দোষ?

নরেন বলে, দোষ যা করেছি আমরাই। আমিই তার মূল। তাই আজ ভগবান এতবড় শাস্তি দিয়েছেন। শালা রমেশ নিজে শেঠ সেজে হোটেলের ঘরে গেল—আজ সেই শালা বলে কিনা আমি ভিখিরী, বেগার! শালাকে ইয়ার দোস্ত বলে জানতাম—

মহাশ্বেতা ওদের কথা বলার আগেই তার টেবিলের টেপরেকর্ডারটা চালু করেছে।

বলে গৌর, তাহলে সেদিনের হোটেলের শেঠের ঢোকা, টাকা দেওয়া এসব সাজানো ঘটনা—

লক্ষ্মী চমকে ওঠে, জবাব দিন! কেন—কেন এতবড় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ওর মনে আমার সম্বন্ধে বাজে ধারণা তৈরী করে সেদিন আমার জীবনে এতবড় সর্বনাশ আনলেন! কেন? কেন নরেনবাবু?

নরেন বলে, সেদিন শয়তান হয়ে উঠেছিলাম নিজেদের স্বার্থে। চণ্ডলের ঘর ভেঙেছিলাম। আজ মনে হয় পাপ—মস্ত বড় পাপই করেছি।

মহাশ্বেতা শুধোয়, সেই লোকটা কে? যাকে সেদিন শেঠ সাজিয়ে ওর চরম বদনাম দেবার জন্য নাটক করতে পাঠিয়েছিলেন? কে সে?

প্রকাশ বলে, নরেনের ও চেনাজানা, মাইরী ওই-ই—

নরেন বলে, তার নাম রমেশ জয়সোয়াল—

মহাশ্বেতার ওই নামটা চেনা। তারই কছে এসে জেল থেকে বাঁচার জন্য মামলায় দাঁড়াতে ওকালতনামা দিয়েছে তাকে।

বলে মহাশ্বেতা, রেশনের দোকানের মালিক! কনট্রাকটার! বিবেকানন্দ রোডে থাকে।

নরেন বলে, হ্যাঁ। শালার বড় দ্যামাক এখন।

এর মধ্যে গৌর বের হয়ে গিয়ে দোকান থেকে রুটি তড়কা-মাংস এসব এনেছে। নরেন, প্রকাশ গিলছে। গৌর বলে, ক'দিন ওই বস্তিতে আর থাকতে হবে না প্রকাশদা, নরেনদা! ক'দিন হোটেলে থাকবে, খাবেদাবে, বিশ্রাম নেবে। আদালতের ব্যাপার চুকলে তারপর তোমাদের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। শুধু যা বললে আদালতে সেই কথাগুলোই বলবে।

মহাশ্বেতা টেপটা শোনায়।

প্রকাশ বলে, আলবৎ বলবো। সত্যি বলতে এ শর্মা ডরায় না।

তবে মাল—

গৌর বলে, তাই পাবে। আর টাকাও।

নরেন খুশী হয়, সিওর বলবো।

গৌর বলে, দুটোকে তো পেলাম কিন্তু নাটকের নায়ক ওই রমেশ জয়সোয়ালকেও তো চাই। সেটা তো শুনি টেঁটিয়া মাল।

মহাশ্বেতা বলে, ওর জন্য ভেব না। তাকে আমিই দেখবো।

চঞ্চলরাও বসে নেই।

এবার মামলার মুখে সিনিয়ার উকিলকে সব কথাই জানাতে হয়েছে চঞ্চলকে।

হরিনারায়ণবাবুও চুপ করে শোনেন।

উকিল বলে, এখন ওই বন্ধুদের দরকার। তাদের সাক্ষীতেই প্রমাণিত হবে লক্ষ্মী আসলে একটা বাজে মেয়েই ছিল। সুতরাং চঞ্চল তাকে ত্যাগ করে ঠিকই করেছে।

চঞ্চলের লোকজন খুঁজছে নরেনদের। কয়েক বছর আর কোন যোগাযোগ নেই। তাদের কোন পাত্তাই পায় না।

চঞ্চল বলে গৌরকে, একটু খবর নে তাদের।

গৌর বাড়িতে এখনও তার ভূমিকাটাকে জানতে দেয়নি। দেখছে বাড়িতে এর মধ্যে দুটো শিবির আলাদা হয়ে গেছে। চঞ্চল আর বড় সাহেব এখন লড়াইয়ে নেমেছে। আর মাসীমা এবার ক্রমশঃ বিদ্রোহিনীই হয়ে উঠেছে।

মনোরমা সেদিনও বলে, আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ো না। মহাশ্বেতা ঠিকই করেছে। সত্যি জেনেই তোমার বৌমা নাতির হয়ে লড়ছে।

—ওর নাম মুখে আনবে না। হরিনারায়ণবাবু গর্জে ওঠেন।

মনোরমা বলে, ভূতের মুখে রাম নাম সহ্য হবে কেন।

—আমরা ভূত।

মনোরমা জানায়, তারও অধম। পিশাচ, অর্থপিশাচ, সম্মানের পিশাচ তোমরা। তাই সত্যিকেও মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে চাও। আর জেনে রাখো—তোমরা যা খুশি করলে, আমিও আমার খুশিমত কাজ করবো।

—কি বলছো তুমি !

স্বামীর কথায় মনোরমা বলে, আমিই মহাশ্বেতার হয়ে ওই বৌমা নাতির হয়ে সাক্ষী দেব তোমাদের বিরুদ্ধে।

হরিনারায়ণবাবু স্ত্রীর অবাধ্যতায় জ্বলে ওঠেন, এতবড় সহাস তোমার ! এ বাড়ি আমার—এখানে আমার কথাই মানতে হবে।

মনোরমা জানায়, তাই এ বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে তোমার নামে ওই আদালতেই খোরপোষের মামলা করবো ওই বৌমার মত।

চঞ্চল অবাক হয়, কি বলছো মা !

মনোরমা বলে, ঠিকই বলছি, আদালত দেখবে, কাগজে খবর বের হবে তোমরা বাপ ছেলে দুজনেই তাদের স্ত্রীকে কতখানি সম্মান করো যে তাদের আইনের আশ্রয় নিতে হয়।

গৌরই থামায়, মাসীমা, এসব কি হচ্ছে, থামুন।

চঞ্চলের লোক খুঁজে খুঁজে নরেনের দোকানেই এসেছে নরেনের খোঁজে। দোকানের মালিক এখন গুপীনাথই। সেই-ই বলে, নরেন ফরেন এখন এখানে থাকে না। এ দোকান এখন আমার।

লোকটা শুধোয়, কোথায় থাকে নরেনবাবু ?

গুপীনাথ খিঁচিয়ে ওঠে, জাহান্নামে।

চঞ্চল হরিনারায়ণবাবুরা সেই বন্ধুদের পাত্তা বের করতে পারে না। উকিল আশ্বাস দেয়, তাহলে ওরাও তাদের খোঁজ পায়নি। সুতরাং আমরা একই মাটিতে দাঁড়িয়ে সমান বাধা নিয়েই লড়ছি। ওরাও প্রমাণ কিছু দিতে পারবে না। তাই যা ঘটেছে তার ওপরই মামলায় আমরাই জিতবো।

ভাবনায় পড়েছে মনোরমা। তারও মনমেজাজ ভালো নেই। দেখছে সে অসহায়ের মত একটা মেয়ে আর দুধের শিশুকে বঞ্চনার চেষ্টা ! তার জন্য হাজার হাজার টাকাও খরচ করছে ওরা। তাই তার মনও মেয়ে হয়ে পুরুষের অন্যায় অত্যাচারের প্রতি প্রতি-রোধের জ্বালা জেগেছে।

গুম হয়ে বসে আছে মনোরমা। বাবা-ছেলে বের হয়ে গেছে। গৌরকে ঢুকতে দেখে চাইল। মনোরমার চোখে জল। বলে সে, এরা এতবড় অন্যায়, মিথ্যাকে সত্যি বলে ওই বংশধর অসহায় ছেলেটাকে বঞ্চনা করবে, ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দেবে গৌর ! তুই তো সব জানিস

—বল এসব সত্যি কি না। বল—আমার মন বলছে ওই-ই চণ্ডলের ছেলে, আমার নাতি। ওরে, কেমন রইল তারা। কত কষ্টে রয়েছে।

গৌর আজ মনোরমাকে বলে, ওরা ভালো আছে মাসীমা।

—তুই জানিস!

গৌর আজ অকপটে মাসীমাকে সব কথাই জানায়। বলে সে, এর ন্যায়বিচারই হবে মাসীমা। যা সত্যি তাই প্রকাশ পাবে। সেদিন চণ্ডলদা প্রকৃতই মেনে নেবেন তো ওদের?

মনোরমা বলে, নিশ্চয়ই নেবে। এ বাড়ির কর্ত্রী আমি—সেদিন ওরা দেখবে আমার অন্য মূর্তি। আর মহাশ্বেতাকে বরং—

সে আলমারী খুলে বেশ কিছু টাকা দেয় গৌরকে।

—এসব! অবাক হয় গৌর।

মনোরমা বলে, মহাশ্বেতাকে দিবি। ওইসব লোকগুলোকে রেখেছিস হোটেলে, ওদের খরচা, বৌমা-ছেলেটারও যেন কোন অসুবিধা না হয়। বড় কষ্টে আছে ওরা। ওটা রাখ। দরকার হলে বলবি।

আদালতে তিল ধারণের জায়গা নেই।

ক'দিন ধরে কাগজে এই বিচিত্র মামলার সম্বন্ধে অনেক খবরই বের হয়েছে। তারাও ভিড় করেছে। এসেছে ফটোগ্রাফার সাংবাদিক সাধারণ মানুষ ও অন্য উকিলরাও এসেছে।

মহাশ্বেতা আজ যেন এক অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। এই মামলা জিততে পারলে তার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিপক্ষের দুঁদে অ্যাডভোকেট দুজন সহকারী নিয়ে লক্ষ্মীকে জেরা শুরু করেছে, চিদাম্বরমকেও তারা প্রমাণ করতে চায় পেশাদার এক নোংরা মানুষ হিসাবে।

মহাশ্বেতা কঠিন কণ্ঠে বাধা দেয়, অবজেকশন ইওর অনার। উনি কেন্দ্রীয় কলা অ্যাকাডেমির একজন সম্মানিত শিল্পী, আমার আইনজ্ঞ বন্ধু সেই সম্মান শিষ্টাচারের কথাও ভুলে গেছেন ধর্মাধিকরণের পবিত্র পরিবেশে।

বিচারক সেই অ্যাডভোকেটকে সংযত হবার কথাই বলেন। এবার তাই সেই অ্যাডভোকেট লক্ষ্মীকে জেরা শুরু করার নামে একই চেষ্টা করতে মহাশ্বেতা জ্বলে ওঠে।

—অবজেকশন ইওর অনার। একজন মহিলা যিনি আইনের কাছে বিচার চাইতে এসেছেন—তাঁকে অশালীন ভাষায় অপমান করার অধিকার নিশ্চয়ই ওঁর নেই!

বিচারক এবারও বলেন প্রতিপক্ষের উকিলকে, আপনি পয়েন্টের বাইরে কেন যাচ্ছেন! সংযত হোন!

হরিনারায়ণ, চঞ্চলরা তাদের উকিলের এলেম, জোরগলার সওয়াল শুনে খুশী। মনোরমা লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে আছে। ওপাশে চিদাম্বরম, সঙ্গে সেই ছেলেটা।

ডাগর কালো চোখে দুষ্টুমিভরা চাউনি। সেই শিশু জানে না তার ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলা চলেছে। সে খুটখাট করছে। হঠাৎ শাড়িতে টান পড়তে চাইল মনোরমা। ডাগর দুচোখ মেলে ছেলেটা তার শাড়ি ধরে টেনে কি যেন মজা করতে চায়।

চঞ্চলের উকিল বলে, আর কোন সাধ্য নেই, ল পয়েন্টও নেই। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে চঞ্চল চৌধুরীর স্ত্রী অসতীভ্রষ্টা—তাই চঞ্চলবাবু তাকে ত্যাগ করে ঠিকই করেছিলেন। ওই মহিলার আর তার জারজ সন্তানের এই দাবী অসঙ্গত।

—না! মহাশ্বেতা বলে, ইওর অনার, মামলা এখনও শেষ হয়নি, আমার আইনজ্ঞ বন্ধু তাঁর ওই ঘৃণ্য অসত্য মন্তব্যর দ্বারা অপ্রমাণিত মিথ্যাকে সত্যের স্বীকৃতি দিতে চান। তাঁকে ওই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বলা হোক!

প্রতিপক্ষের উকিলও গলা তোলে। খুশী হন হরিনারায়ণ, চঞ্চল।

আদালতকে এবার জানায় মহাশ্বেতা, আমার সাক্ষীদের হাজির করার অনুমতি দেওয়া হোক!

চাইল চঞ্চল।

চমকে ওঠে—কাঠগড়ায় উঠেছে প্রকাশ!

তারপর নরেন! স্তব্ধ আদালত। প্রকাশ-নরেন লক্ষ্মীকেও সনাক্ত করে। তারপর জানায় তাদের ষড়যন্ত্রের কথা। আরও একজন গেছল হোটেলের ঘরে নাটকের চরিত্র হিসাবে যাকে দেখে চঞ্চল লক্ষ্মীর সম্বন্ধে ওই ধারণাটা করে তাকে তাড়িয়েছিল।

প্রতিপক্ষের উকিল বাধা দিতে ওঠে, ওসব মিথ্যা সাক্ষী!

সাজানো—

গৌরই জানায় তার সাক্ষ্যে, ওরাই চঞ্চলদার বন্ধুর দল। যা যা বলছে তা সত্যিই।

চঞ্চল গর্জে ওঠে, গৌর! এতবড় বেইমান তুই!

আদালতে সাড়া জাগে। চঞ্চলকে পুলিসই ধরে বসিয়ে দেয়।

প্রতিপক্ষের উকিল তবু জানায়, এতে প্রমাণিত হয় না ওই মহিলা নির্দোষ। সেই লোকটা—

মহাশ্বেতা বলে, এবার সেই রমেশ জয়সোয়ালকে ডাকছি ইওর অনার।

রমেশ জয়সোয়াল মহাশ্বেতার মক্কেল। আজ নিজে বাঁচাব জন্য রমেশ সব ষড়যন্ত্র, নাটকের কথাগুলোই পরিষ্কার করে জানায়। আজ সে দুঃখও প্রকাশ করে, এমনি সর্বনাশ হবে ওই নির্দোষ মেয়েটির তা ভাবিনি ধর্মাবতার। ওই মেয়েটি নির্দোষ। ওই ছেলে চঞ্চলবাবুরই বৈধ সন্তান।

প্রতিপক্ষ উকিল আপত্তি তোলেন, অবজেকশন—

মহাশ্বেতাও সপাটে জবাব দেয়, আমার সাক্ষীকে উনি বক্তব্য রাখতে বাধা দিচ্ছেন ইওর অনার। অবজেকশন—

বিচারকও দেখছেন ওই ছোট শিশু, ওই মেয়েটিকে। মহাশ্বেতাকে। একজন মেয়ে তার সব দাবী ছেড়ে দিয়ে ওই মা-সন্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর সাক্ষ্য-প্রমাণও সব হাজির করেছে যথাযথ ভাবে।

তাই তাঁর রায়ও তৈরী হয়ে যায়।

আদালতের সব মানুষ অধীর আগ্রহে শুনছে ওই মামলার রায়।

জয়লক্ষ্মী দেবীর আবেদন আইনানুগভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে আমি অত্র আদালতে এই মর্মে রায় দিতেছি যে উক্ত জয়লক্ষ্মী দেবী চঞ্চল চৌধুরীর ধর্মপত্নী, এবং তাহাদের বৈধ সন্তান নচিকেতা চৌধুরী। সুতরাং চঞ্চল চৌধুরীকে সেইমত নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে—

আদালত খুশীতে ফেটে পড়ে!

মনোরমা আবেগ ভরে ছোট ছেলেটাকে এবার প্রকাশ্যে বুকে জড়িয়ে ধরে যেন পরম তৃপ্তি—শান্তির সন্ধান পান। প্রণাম করে

ভীতগ্রস্ত জয়লক্ষ্মী মনোরমাকে।

মনোরমা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

হরিনারায়ণবাবু নির্বাক স্তব্ধ চাহনি মেলে পাথরের মূর্তির মত দেখছে। আজ আদালতের মানুষের চোখে তাদের জন্য ঘৃণা নেই—আছে স্বীকৃতির তৃপ্তি।

লক্ষ্মী প্রণাম করে হরিনারায়ণকে—ছোট ছেলেটা অকুণ্ঠ কণ্ঠে মনোরমার কোল থেকে ডাকে, দাদু?

চাইলেন হরিনারায়ণবাবু।

চঞ্চল স্তব্ধ। খুশীর চিহ্ন ফুটে ওঠে গৌরের চোখে।

—চঞ্চলদা!

চঞ্চল গর্জে ওঠে, তুই, তুই-ই যত নষ্টের মূল পাজী—

চঞ্চল দেখছে লক্ষ্মীকে—আজ তারও মনে হয় কি এক গভীর চক্রান্তের শিকারই হয়েছিল সে ওই শয়তানদের জন্য!

সন্ধ্যা নামছে।

আদালত প্রায় খালি। হরিনারায়ণবাবুরা বাড়ি ফিরে গেছেন তাঁর বৌমা, নাতিকে নিয়ে। মনোরমাও খুশী!

জনহীন আদালতের বারান্দায় আবছা আলোর ছায়া অন্ধকার নেমেছে। ওই নির্জন ছায়া অন্ধকারময় বারান্দা দিয়ে চলেছে একজন।

গৌর দেখছে।

মহাশ্বেতাদি ফিরছে আজ একা। আদর্শের লড়াইয়ে জিতেছে কিন্তু তার জন্য একজন নারী দিয়েছে অনেক মূল্য। তার স্বপ্ন সাধ ভালোবাসার স্পর্শটুকুও অতল হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ নির্জন অন্ধকারে জুতোর শব্দটা ওঠে—ঠক্ ঠক্ ঠক্!

শব্দটা ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যায়—ওই আলো-আঁধারির মাঝে হারিয়ে যায় মহাশ্বেতা সেন!

গৌর নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে আর কাউকে দেখা যায় না। অন্ধকারে শুধু দু'একটা আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হয়ে জেগে থাকে।

সমাপ্ত